নিপাতনে সিদ্ধ

ইন্দ্রমিত্র

চয়নিকা

৪৭, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
দেবাশিস মজুমদার
চয়নিকা
৪৭, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

মুদ্রক :
শুভাশিস মজুমদার
চয়নিকা
৪৭, কেশবচন্দ্র সেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীনিখিল সরকার

সুহৃদবরেষু

বর্তমান পুস্তকে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রাদির প্রতিলিপি স্বর্গত সজনীকান্ত দাসের পুত্র শ্রীরঞ্জনকুমার দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাঁকে ধন্যবাদ।

'নিপাতনে সিদ্ধ' ইতিপূর্বে 'ভারতকথা' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে অংশবিশেষ সংশোধিত ও সংযোজিত হয়েছে।

ইন্দ্রমিত্র

বঙ্গদেশের সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করে শনিবারে-শনিবারে একখানা চটি সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব করেছেন 'প্রবাসী' ও 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়। প্রস্তাব নিষ্ফল হয়নি। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ। সম্পাদক যোগানন্দ দাস।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র অষ্টম সংখ্যায় সজনীকান্ত দাসের 'আবাহন' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে সজনীকান্তের কোনও কবিতা কোথাও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৮ আশ্বিনের সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র একাদশ বা শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সজনীকান্তের 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ' নামে একটি কবিতা।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তখন কলকাতায় বিশ্বভারতীর হর্তকর্তা-বিধাতা এবং সজনীকান্ত তখন বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখার কাজে বহাল। প্রুফ দেখার জন্য সজনীকান্ত কোনও টাকা-কড়ি পাননি, শুধু আশ্রয় পেয়েছেন কলকাতায় বিশ্বভারতী আপিসের চারতলায় একটি খুপরিতে—একটি অব্যবহৃত ক্ষুদ্র শৌচাগারে।

গভীর রাত্রে সজনীকান্ত একদিন রবীন্দ্রনাথের গানের প্রুফ দেখছেন, প্রশান্তচন্দ্র ডেকে পাঠালেন সজনীকান্তকে। প্রথমেই

প্রশ্ন করলেন—'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ' তোমার লেখা ?

সজনীকান্ত উত্তর দিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রশান্তচন্দ্র বললেন—খুব ভালো লেখা। কিন্তু এসব বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে বিশ্বভারতীর সেবায় পুরোপুরি লেগে গেলে কতকটা স্থায়ী কাজ করতে পারো। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা বাকি আছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা বাকি আছে—প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে এ-বিষয়ে সজনীকান্ত একমত বটে, কিন্তু 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ'কে তিনি বাজে কাজ মনে করতে পারলেন না। সুতরাং সজনীকান্ত অবিলম্বে বিশ্বভারতী থেকে বিদায় নিলেন।

'শনিবারের চিঠি' সপ্তাহে-সপ্তাহে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু খরচ ওঠেনি ; খরচ জুগিয়েছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। 'শনিবারের চিঠি'র জন্য অশোক চট্টোপাধ্যায় বারংবার বহু ক্ষতি স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে সজনীকান্ত লিখেছেন : "সাপ্তাহিকের ত্রয়োদশ সংখ্যা বাহির হইতে না হইতে দেখিলাম কেমন করিয়া জানি না আমিই কর্তা হইয়া পড়িয়াছি, লেখা, লেখা-নির্বাচন প্রুফ দেখা কাগজ বিলি ও বিক্রয় সকলই আমাকে করিতে হইতেছে, সম্পাদক যোগানন্দবাবু নামমাত্র সঙ্গে থাকেন। উনবিংশ সংখ্যায় সহকারী সম্পাদকরূপে আমার নাম ছাপাও হইল।"

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৫ মাঘ প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চবিংশ সংখ্যায় 'কেবলরাম' বেনামীতে সজনীকান্ত নিজেকে ও মোহিতলাল মজুমদারকে নিয়ে 'দুই দিক' নামক একটি রচনা লিখেছেন। এই রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই সজনীকান্ত, বলা বাহুল্য, মোহিতলালের সান্নিধ্যে এসেছেন। সজনীকান্ত এই রচনায় গল্পস্থলে সে-যুগের মোহিতলালের চরিত্রচিত্রণ করেছেন :

"একদিন ছিন্নবেশে দরিদ্র ভিখারীর মত সারকুলার রোড ধরিয়া চাকুরির খোঁজে চলিয়াছি, পথে এক স্থানে হঠাৎ নিজের নাম শুনিয়া

চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, এক চায়ের দোকান হইতে 'ম' বাবু বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। খাঁটি কবি। কোন এক স্কুলে মাস্টারি করেন। অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও কবিতা আর বনিতা লইয়াই ভরপুর আছেন। কাছে আসিতেই 'কি হে কেবলরাম ভায়া ?' বলিয়া একেবারে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন, আমার জীর্ণ বেশ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'কি হে, কবিতাদেবী তোমার স্কন্ধেও ভর করলেন না কি ?' আমি আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। তিনি ব্যথিত চিত্তে বলিলেন, 'তুমি আমার ওখানে যাওনি কেন ভাই ? আড়াই জনের পেট যদি ভরে, তবে সাড়ে তিন জনের পেটও ভরবে।' দোকানে উপবিষ্ট তাঁহার বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া আমাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

"অত্যন্ত এঁদোগলিতে একটি জীর্ণ বাড়ি। তেতলায় দুইটি মাত্র ঘর। আর একটি নামমাত্র রান্নাঘর। দুইটি ঘরের মধ্যে একটিকে ঠাকুর ঘর বলিলেও চলে। সেইটি 'ম' বাবুর বৈঠকখানা। তাঁহার মেয়ে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াই আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। 'ম' বাবু তাহাকে কোলে লইয়া আমাকে তাহার কাকাবাবু বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওগো, আজ আমাদের অতিথিশালা সরগরম।' আমরা গিয়া বৈঠকখানায় বসিলাম। বাড়ির চতুর্দিকের জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম—এই দুঃস্থ পরিবারের ঘাড়ে বোঝা হইয়া থাকা! আমি অবিলম্বে প্রস্থান করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলাম।

" 'ম' বাবু বলিলেন, 'ভায়া, গিন্নী রান্না করুন, আমরা ত তক্ষণ একটু কাব্যচর্চা করি। খুকী ঘুমিয়েছে।' তিনি তাঁহার দপ্তরপত্র টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

" 'ম' বাবু ৪৫ টাকা মাহিনার সামান্য স্কুল মাস্টার; মাসে ১৫ টাকা তাঁহার ঘরভাড়াতেই লাগে। আজ মাসের ২৯ তারিখ, হয়তো কাল কি করিয়া রান্না চড়িবে তাহার ঠিক নাই। সেই লোক একটি স্থায়ী

অতিথিকে ঘরে আনিয়াও নিরুদ্বেগে কবিতা শোনাইতে বসিলেন! ধন্য কবিতাদেবী! ..."

সে-যুগের মোহিতলালের এই চরিত্রচিত্রণের প্রায় তিরিশবছর বাদে সজনীকান্ত লিখেছেন: "শুধু সে যুগের কেন, সর্বযুগের মোহিতলালের ইহাই খাঁটি পরিচয়; তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম বলিয়াই আমি সেই দুঃসময়েও ভাঙিয়া পড়ি নাই...।"

আবার সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র কথায় ফিরে যাই। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সপ্তবিংশ কিংবা শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৯ ফাল্গুন।

দীর্ঘ পাশ্চাত্ত্য সফরের পর রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে ফিরেছেন ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৫ ফাল্গুন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে 'প্রবাসী'তে তাঁর পশ্চিমযাত্রার কাহিনীর ধারাবাহিক প্রকাশ মাঘের পর বন্ধ হয়ে আছে; পশ্চিমযাত্রার কাহিনীব জন্য প্রবাসী'র তরফ থেকে তাঁকে তাগাদা দেওয়া হল; তিনি জানালেন -লেখা বীজাকারে তাঁর নোটবইতে আছে, নিজের হাতে লেখার উৎসাহ তাঁর নেই, উপযুক্ত লেখক পেলে মুখে মুখে বলে যেতে রাজী আছেন।

অশোক চট্টোপাধ্যায়েব সহৃদয়তায় সজনীকান্ত 'প্রবাসী'র প্রুফ রীডার হয়ে গেলেন—মাইনে চল্লিশ টাকা। অবশ্য গোড়ার কাজ রবীন্দ্রনাথের 'পশ্চিমযাত্রীব ডায়ারি'র অনুলিখন ও কপি আহরণ। ইতিপূর্বে সজনীকান্ত কিছুদিন অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন—মাইনে পঁচিশ টাকা।

'পশ্চিমযাত্রীব ডায়াবি'র অনুলিখনের কথা জরুরি। রবীন্দ্রনাথ তখন আলিপুরে প্রশান্ত মহলানবীশেব অতিথি। অতএব সজনী-কান্তকেও সাময়িকভাবে সেখানে ডেরা বাঁধতে হল। পরবর্তীকালে সজনীকান্ত লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথকে আ.শৈশব ভালবাসি ভক্তি করি, তাঁহার সহিত কৌশলে পত্রব্যবহার করিয়াছি, তাঁহার সান্নিধ্যেও আসিয়াছি, কিন্তু এতখানি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সম্ভাবনার কথা আমার

সুদূরবর্তী কল্পনাতে ছিল না। দিনরাত্রি সর্বদা কয়েকদিন একসঙ্গে থাকিতে হইয়াছিল, এক টেবিলে আহার করিতাম, এক ঘরে শয়ন করিতাম। খেয়াল হইলেই তিনি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া নোটবইটি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া মুখে মুখে ডায়ারি রচনা করিয়া চলিতেন, আর আমি লিখিয়া যাইতাম। ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ তারিখ হইতে শেষ পর্যন্ত আমার অনুলিখন। মাঝে মাঝে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সুষ্ঠু শব্দ হাতড়াইতেন, আমি সাধ্যমত কথা যোগাইতাম, অনেক শব্দ এবং কিছু কিছু বাক্য যে আমার রচনা নয় তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারিব না। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁহার বক্তব্যের সম্পূর্ণ মৎকৃত রচনার নীচে স্বাক্ষর করিয়া তিনি আমাকে প্রভূত সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু সেই গোড়ার দিকে নিতান্ত কাঁচা বয়সে এই সম্মানে আমার দেহে রীতিমত স্বেদ-পুলক-কম্প হইত। নিভৃত আলাপের সুযোগে তাঁহার কাছ হইতে বাংলা-সাহিত্য বিষয়ে অনেক অভিমত ও উপদেশ আদায় করিয়া লইয়াছি, তাঁহার সেই সময়কার অনেক ইঙ্গিত আমার জীবনের সাহিত্য-পথের পাথেয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিশ্রাম দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ফলে বিশেষ নজর দিয়া সমসাময়িক বাংলাসাহিত্যচর্চার অবকাশ তাঁহার ছিল না, কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞ দৃষ্টি এক নজর যাহা দেখিত তাহারই সঠিক মূল্য বিচার করিয়া লইতে পারিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি নূতন কবিতা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে তখন আকৃষ্ট করিয়াছিল, তিনি প্রায়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। আমি বাল্যে ও কৈশোরে পয়সার অভাবে তাঁহার বই খরিদ করিতে না পারার দুঃখ কি ভাবে তাঁহার সতেরখানি বই ('গোরা' তন্মধ্যে একখানি) হাতে নকল করিয়া মিটাইয়াছিলাম, সে কথা শুনিয়া তিনি একদিন যথেষ্ট কৌতুক ও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। নকলগুলি তখন পর্যন্ত আমার নিকটে কলিকাতাতেই ছিল, আমি প্রমাণ দাখিল করিলাম। এতখানি তিনিও আশা করেন নাই। তিনি সেগুলি আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া

লইলেন। অনেককেই সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং অনেকের কাছে গল্প করিয়াছেন সে কথা পরে জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বহুমূল্য নকলগুলির কি দশা হইয়াছে তাহা আর জানিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত পরবর্তী যাবতীয় পুস্তকের এক খণ্ড আমাকে বিনামূল্যে দিবার হুকুম দিয়াছিলেন, ইহাতেই আমার বাল্য-কৈশোরের শ্রম সার্থক হইয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথের কৃপায় সজনীকান্ত আবার বিশ্বভারতীতে প্রুফ দেখার কাজে বহাল হয়েছেন বটে, কিন্তু সে-কাজ নির্বেতন আপখোরাকি।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের চৈত্রের 'প্রবাসী'তে সজনীকান্তের 'নারী' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ; এবং সজনীকান্ত অচিরাৎ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন— মাইনে পঁচাত্তর টাকা। সহকারী-সম্পাদক হিসেবে সজনীকান্তের এই মাইনে বেড়ে পরে পঁচানব্বুই টাকা হয়েছে।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'প্রবাসী'তে সজনীকান্তের 'সভ্যতা' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর রামানন্দ একদিন সজনীকান্তকে বললেন—তোমার একটি দীর্ঘ কবিতা বৈশাখের 'প্রবাসী'তে বের হয়েছে দেখলাম। এখনও পড়িনি। এদেশে যারা কবিতা লেখে তারা কাজের লোক হয় না। দেখি, তুমি কি করো!

পরে রামানন্দ অনেক কঠিন-কঠিন কাজের ভার সজনীকান্তকে দিয়েছেন। কিন্তু সজনীকান্তের কর্মক্ষমতা-সম্পর্কিত বিচারের ফলাফল তিনি কখনও ঘোষণা করেননি।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৯ চৈত্র কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পৈশাচিক তাণ্ডব আরম্ভ হল। আপিসে যাতায়াতের পথের অভিজ্ঞতা থেকে সজনীকান্ত দাঙ্গা সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। সেগুলি ছাপাতে হলে আবার 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশ করতে হয়। সজনীকান্ত তারই আয়োজন করতে লাগলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একদিন সজনীকান্তকে ডেকে প্রশ্ন করলেন

যে 'শনিবারে চিঠি'র পুনঃপ্রকাশের কোনও মতলব আছে কিনা ?

সজনীকান্ত হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা দাঙ্গা-সংখ্যা বের করব মনে করছি।

রামানন্দ বললেন--মারামারি সম্বন্ধে লেখা দিও, কিন্তু সংখ্যাটির নাম দিও—জুবিলী-সংখ্যা। আমি কিছু লেখা দেব।

খোদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থন, অতএব সজনীকান্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন।

দুদিন পরে রামানন্দের দুটি বেনামী রচনা সজনীকান্তের হাতে এল। সঙ্গে একখানা চিঠিতে রামানন্দ লিখেছেন: "সজনীকান্ত, অসুস্থ শরীরে এইগুলি লিখিলাম। তোমাদের চলে কিনা ভাল করিয়া দেখিয়া তবে ছাপিতে দিবে।"

রামানন্দের প্রথম রচনাটি দাঙ্গা-সংক্রান্ত ; দ্বিতীয় রচনাটির নাম—'শনিবারের চিঠি'র জুবিলী সংখ্যা।

'শনিবারের চিঠি'র জুবিলী সংখ্যা প্রকাশিত হল ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১৫ জ্যৈষ্ঠ। রামানন্দের দ্বিতীয় রচনাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: "উনপঞ্চাশ বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে। সেইজন্য আমরা উহার এই জুবিলী সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি। গ্রাহক ও পাঠকগণ পঞ্চাশ বৎসরের চাঁদা অগ্রিম দিলে বাধিত হইব। বিজ্ঞাপনদাতাগণও পঞ্চাশ বৎসরের মূল্য অগ্রিম চুকাইয়া দিলে বড়ই আপ্যায়িত হইব।"

'শনিবারের চিঠি'র বিরহ-সংখ্যা প্রকাশিত হল ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে, এবং ভোট-সংখ্যা প্রকাশিত হল ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের কার্তিকে। মূলত সজনীকান্তেরই চেষ্টায় 'শনিবারের চিঠি'র জুবিলী-সংখ্যা, বিরহ সংখ্যা ও ভোট-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তরকালে সজনীকান্ত লিখেছেন, "রবি (রবীন্দ্রনাথ মৈত্র) ছিলেন অস্থির প্রকৃতির সক্রিয় আশাবাদী। 'শনিবারের চিঠি'র অভাবে আমাকে মনমরা দেখিয়া তিনি আমার পিঠে সজোরে থাবা মারিয়া

সোৎসাহে বলিলেন, কুছ পরোয়া নেহি, চল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে, সেখানেই ব্যবস্থা হবে। গোলদীঘির পূর্বপারে এখন যেখানে বিশ্বভারতী পুস্তকালয় সেই বাড়িতে কিংবা তাহারই আশেপাশে কোনও একটা বাড়িতে তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আপিস। রবি 'আনন্দবাজারে'র নামে বেনামে লিখিতেন। প্রথম দিনেই টের পাইলাম, শ্রীমাখনলাল সেন, প্রফুল্লকুমার সরকার ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রবিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাঁহার পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আমিও সেই দিন হইতেই স্নেহাশ্রিত হইলাম। ব্যবস্থা হইল শনিবাসরীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা 'শনিবারের চিঠি'র জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে; তাহাতে আমরা শনিমণ্ডলী যাহা খুশি লিখিব। কয় সপ্তাহ 'শনিবারের চিঠি' এইভাবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ক্রোড়স্থ হইয়া বাহির হইয়াছিল সঠিক তাহা বলিতে পারিব না, পুরাতন ফাইল ঘাঁটিয়া বাহির করাও আজ দুর্ঘট, তবে এইটুকু বেশ মনে আছে মাসাধিক কাল তো বটেই। এইভাবে ক্ষেত্রান্তরে উপ্ত হইয়া 'শনিবারের চিঠি'র আর একটু প্রসার বাড়িল, আমার লাভ হইল বেশ কয়েকজন বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী।"

সজনীকান্ত, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন, রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখেছেন :

"সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে এক ধরণের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' নামক দু'টি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরণের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গল্পের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ ক'রে চলে না। কবিতা, Stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না; গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাঁধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি

উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরণের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি প'ড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য ব'লে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে-সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান ক'রে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার শ্রেণীভুক্ত ব'লে প্রচার করবার একটা চেষ্টা দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ব'লে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি, 'কালি-কলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। আপনি এসব লেখার দু'একটা প'ড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠি'তে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোনো প্রবলপক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট ক'রে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্যপথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি।

"আমি জানি না, এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি? নরেশ-বাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকারের প্রশংসা, বুঝতে পারি না। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা ব'লে মনে করি। বাঙলা

সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার পূর্ব্বেই এই ধরণের লেখার মোহে প'ড়ে নষ্ট হ'তে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেইজন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন।

"আপনাকে আজ এই চিঠি লেখার একটি কারণ—(কার্ত্তিকের) ভারতীতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধ 'সাহিত্যে শুচিবিকার।' এই প্রবন্ধটিকে এই সম্প্রদায়ের লেখকগণ ইতিমধ্যেই নজির স্বরূপ দাখিল করেছেন। সেই প্রবন্ধটি আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

"আজ দশ বৎসর ধরে আপনার লেখা প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছে আপনি সাহিত্যে শ্লীলতার গণ্ডী পার হ'য়ে যাওয়ার পক্ষে নন। আপনার লেখার এমন কোনো জায়গা আমি দেখিনি যেখানে আপনার চিত্রিত চরিত্র সংযম হারিয়েছে। ঠিক যতটুকু পর্য্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন, ততটুকুর বেশী আপনি কখনও যাননি। অথচ যে-সব জিনিষ নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন সেইসব জিনিষই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ করত ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। 'এক-রাত্রি', 'নষ্টনীড়', ও 'ঘরে বাইরে' এরা লিখলে কি ঘটত—ভাবতে সাহস হয় না।

"নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্ভবত আপনি নিজে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' লিখেছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'উষা' নামক উপন্যাসের সমালোচনায় তাতে লিখিত আছে—"সুনীতির হিসাবে এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি না। বিনোদিনী ও যোগেশ্বর সম্বলিত যে চিত্র গ্রন্থকার আমাদিগকে দেখাইয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক নহে—এমন অবস্থায় এমন ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটে। কিন্তু পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। ····কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা? তাই আবার পাঁচকড়িবাবুর ন্যায় ক্ষমতাশালী

লেখকে করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য! ······যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে?'

"এই চিঠির উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য যদি আমার হয় তাহলে সেটি প্রকাশ করবার অনুমতি আমি আপনার কাছে চেয়ে রাখছি।

"আপনার নিকট এভাবে জবাব দাবী করতে গিয়ে যদি কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে থাকি তাহলে এই ভেবে ক্ষমা করবেন যে, আমি একা নই—আমার এই চিঠিতে আমি অন্ততঃ আমার পরিচিত কুড়ি বাইশ জন সাহিত্যসেবীর মনোভাব ব্যক্ত করেছি। ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষা ব'লে দেখা পায়। আপনি কথা বললে আর যাই বলুক, ঈর্ষার অপবাদ কেউ দেবে না।

"আমার প্রণাম জানবেন"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন, সজনীকান্তকে একখানা চিঠি লিখেছেন:

"কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাকসংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হ'তেও পারে। আলোচনা করতে হ'লে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্র দৃষ্টির প্রভাব প্রবল—তাই এখন বাগ্‌বাত্যার ধূলো দিগদিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলবার বলব।"

'সাহিত্যধর্ম' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'বিচিত্রা'য়—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে। 'সাহিত্যধর্ম' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি:

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা

যে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করচেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলচে, ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

"এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই,—পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেচে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্ব্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

"সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ-সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্ত্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সঙ্গীত কিনা। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে এক-রকম উল্লাস হয়, কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-

একটা জোরও আছে। মাধুর্য্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য কথার নয়।

"উপসংহারে এ-কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে সলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসন-মূর্ত্তি ধ'রে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবী করচে, সে-দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে? ভারত সাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায়, 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?' উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেচে!' ভারত সাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী!"

ওদিকে 'শনিবারের চিঠি' নিয়ে খবর আছে। একদিন সকালে চা খেতে-খেতে সম্পাদক যোগানন্দ ও সহকারী সম্পাদক সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি' নিয়মিত পুনঃপ্রকাশের সঙ্কল্প করেছেন। অতঃপর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৯ ভাদ্র মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র ভাদ্র সংখ্যা প্রকাশিত হল। মাসিকপত্র হিসেবে এই 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক যোগানন্দ, সহকারী সম্পাদক সজনীকান্ত। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' নামক একটি প্রবন্ধের পাদটীকায় সজনীকান্ত লিখেছেন:

"...কবি এই (আধুনিক বাঙলা সাহিত্য) সম্পর্কে শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'সাহিত্যধর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কবি যে এতদিন পরে সাধারণের নিকট আপনার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন

তাহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।" ('শনিবারের চিঠি', ভাদ্র, ১৩৩৪, পৃ. ২)

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত রাধারাণী দত্তের 'সাগর-স্বপ্ন' নামক গল্পটি থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি:

"অসিতা ও নীলিকা হাত ধরাধরি করে ঢেউয়ের বেগ ঠেলতে প্রথম 'ব্রেকার'টা পার হ'য়ে দ্বিতীয়টার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। অসিতা আরও অগ্রসর হবার ইচ্ছা করায় নীলিকা বলল—"না ভাই, আজ আর আমি খুব বেশী এগোব না—কারণ, আজ আমার 'আন্‌ডার-অয়ার্' নেই, শুধু সেমিজ পরে এসেচি। তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গেছে।"

অসিতা বলল "আমি দাদার হাফ্‌প্যাণ্টে কাজ চালিয়ে নিই। নিজের 'ইজের বডি' বা 'পা-জামা'গুলো পরে সমুদ্রে এখন আর নাইতে আসিনে--কারণ, সেগুলো টুইলের লংক্লথের কিম্বা খদ্দরের তৈরি, কাজেই বড্ড শীগ্‌গির ছিঁড়ে যায়। জিনের হাফ্‌প্যাণ্টগুলো ছেঁড়ে না।"

নীলিকা হেসে বলল "সাদা কাপড়ের কিম্বা পাতলা কাপড়ের 'আনডার ক্লথে' সমুদ্র স্নান পোষায় না; বিশেষতঃ মেয়েমানুষের। শীঘ্র ছিঁড়ে যায়, আর ভিজে গেলে পরা-না-পরা সমান হয়ে দাঁড়ায়। আমি কাকাবাবুর পুরানো মোটা খাদি 'ইউনিফর্ম' কেটে নিজের গায়ের মাপে একটা নিজের মনের মত 'সুইমিং-কষ্টিউম' তৈরি করে নিয়েচি।"

অসিতা সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড ঢেউ পিঠ নীচু করে মাথার উপর চলে যেতে দিয়ে, তার টাল্ সামলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কি রকম কাটের করেছিস? সাঁতার কাটবার 'অর্ডিনারী' যে কালো 'সুইমিং কষ্টিউম'গুলো দেখা যায়, ঐ রকমই তো?"

নীলিকা ঢেউয়ের সঙ্গে উঠা-নামা করতে করতে মাঝে মাঝে থেমে থেমে বলল—"না, ও রকম ঢিলে করিনি, বেজায় বালি ঢোকে।

অনেকটা 'ইজের বডি'র ধরণের কাট হয়েছে—অথচ খুব টাইট করে করেচি। খাকির একটি মাত্র দোষ—ভিজলে একটু ভারী হয়। তা টাইট করে ফিট করলে তা' টেরই পাওয়া যায় না, অথচ অনেক স্থবিধা—হাজার ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ছেঁড়ে না, ভিজলেও কিছু ক্ষতি হয় না।…"

রাধারাণী দত্তের গল্পের উদ্ধৃত অংশটুকু ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা' বিভাগে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। ফলে 'শনিবারের চিঠি' রাধারাণী দত্তের সামাজিক লাঞ্ছনার কারণ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৮ কার্তিক, অশোক চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন : "খুড়ু, তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড় বড় মহামোহোপাধ্যায়দের পণ্ড পাণ্ডিত্যের বর্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখতে পাই—তাতে খুসি হই—কিন্তু তোমাদের শনিবারের চিঠির সমরাঙ্গনে আহতদের মধ্যে কোনো নারীকে ধরাশায়িনী দেখলে আমার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না—তারা অপরাধিনী হলেও। নারীদের প্রতি পুরুষস্বভাবের অন্তর্গূঢ় করুণাই তার একমাত্র কারণ নয়—আরো একটা কারণ আছে। তোমাদের হাতে মার খেয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের যে লজ্জা সেটা সাহিত্যিক লজ্জা,—কিন্তু মেয়েদের লজ্জা তার উপরে আরো বেশি, সেটা সামাজিক। সিভিল ক্রিমিনাল দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে "ছায়েবানুগতা", ওরা যদি দোষ করে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত করে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তাহলে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময়ে মূলবস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখতে হয়—মেয়েদের অপরাধও তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো বলে মনে হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্ম্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে; আগে

আগে যে দুঃসহধর্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা করে দেখো।"*

বলা বাহুল্য হলেও বলা দরকার, অশোক চট্টোপাধ্যায় তখন 'শনিবারের চিঠি'র মালিক। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ডাক নাম 'খুতু'।

'যাত্রীর ডায়ারি'র অন্তর্গত 'সাহিত্যে নবত্ব' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবাসী'তে—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে। 'সাহিত্যে নবত্ব' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

"আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হ'বার মতো যথেষ্ট সময় পাইনি একথা আমাকে মানতেই হ'বে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হ'য়েছে তাতে বারবার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলচি এই জন্যে. তাঁর লেখার তালঠোকা পাঁয়তাড়া মারা পালোয়ানি নেই। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হ'তে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই. শক্তির মর্য্যাদা আছে ; সাহস আছে, বাহাদুরী নেই। আরো অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—বোঝা যায় যে, বঙ্গ-সাহিত্যে একটি সাহসিক অধ্যবসায়ের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হইনে।

"কিন্তু শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে

---

* আলোচ্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির প্রতিলিপিসমেত অরবিন্দ গুহের একখানা চিঠি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য—'দেশ', ১৬ জুন ১৯৯০, পৃ ৭।

প্রতিলিপি দেখে আমি নিঃসন্দেহ যে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে 'মহামোহোপাধ্যায়ের' শব্দটির 'মোহো' অংশটুকু মোটা দাগে লিখেছেন।

(7)

Santiniketan
Feb. 13. 1928

I know Babu Sajanikanta Das and I can certify that he is an author whose mastery of Bengali language and knowledge of our literature is remarkable.

Rabindranath Tagore

পার হ'য়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গীতে কেবল জলের নীচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধিগতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কারি হ'য়ে ওঠে;—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে—সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকের পাকশালায় সেইগুলো হচ্চে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর।' ওর মধ্যে একটা হচ্চে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর -একটা লালসার অসংযম।

"অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে —যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার ক'রে থাকি, আমর ই জানি কাকে বলে লাইফ' এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেসক্রিপশনের মতো হ'য়ে উঠচে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্রনারায়ণের' ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেননি,—ভালোরকম উপার্জ্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন;—দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্য সাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্ব্বদাই ঝালমসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডরের যোগে একটা কৃত্রিম শস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠচে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে ও একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের

পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।

"শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েচি। দেখেচি, দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে ব'লেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য-ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্য্যাদা অতিক্রম ক'রে নকল দারিদ্র্যের সখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করচি জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি —দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তার কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেচি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেচেন ব'লেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডরি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।

"সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায়নি বা এর পরে স্থান পাবে না এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু ও জিনিষটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদজনক। বলা বাহুল্য সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুলচিনে! বিপদের কারণটা হচ্চে, ওটা অত্যন্ত শস্তা --ধূলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ ধূলোয় যার লুটোতে সংকোচ নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়।···

"আমি দেখেচি কেউ কেউ বলচেন, এই সব তরুণ লেখকদের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেচে ব'লেই এইরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হ'য়ে উঠেচে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেচেন, তার প্রধান কারণ এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় আমরা কিছু মানিনে, —এটা তরুণের ধর্ম। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না মানতে শক্তির দরকার করে —সেই শক্তির অহঙ্কার তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অহঙ্কারের আবেগে তারা

ভুল ক'রেও থাকে—সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্দ্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু যেখানে না মানাই হচ্চে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের শস্তা অহঙ্কার তরুণের পক্ষেই সবচেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানিনে যদি বলতে পারি তাহ'লে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে, তাহ'লে সামান্য খরচাতেই উপস্থিত মতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।"

আধুনিক সাহিত্য-প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'তে কিছু লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৩ অগ্রহায়ণ, একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা উদ্ধৃত করি: "দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে আমাকে টেনো না। নিজে যদি সাহিত্যিক না হতুম তা হ'লে তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি হতুম—কেননা আমার পক্ষে এটা ক্যানিবলিজম দাঁড়ায়। 'প্রবাসী'তে এবার যেটা লিখেচি সেটাতেও হয়তো অনেকের গায়ে বাজবে—কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টনটনে হয়ে রয়েছে। যৌবনের তীব্রতা গিয়ে অবধি আমার কলম প্রায় জৈনমতে চলতে চায়, এখন সময় অল্প ব'লেই সেই সঙ্কীর্ণ সময়-টার গায়ে রক্তের দাগ লাগাতে সঙ্কোচ হয়—ধুয়ে ফেলবার অবকাশ পাব না। অল্প কটা দিন আছে—শেষ ব্যবহারের জন্যে স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছা করে। তোমার হ'ল সার্জিকাল ডিপার্টমেন্ট, আর আমার আরোগ্য স্নানের মহল। তোমার বয়স যদি পেতুম তোমার ব্রতে যোগ দেওয়া সহজ হ'ত।"

উত্তরকালে সজনীকান্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন যে এই সময়ে মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র কর্ণধার হয়েছেন। সজনীকান্তের উদ্দেশে মোহিতলাল একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি " 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশে" নামে প্রকাশিত হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'তে—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের পৌষে:

" 'শিব'-নাম জপ করি' কালরাত্রি পার হ'য়ে যাও—

হে পুরুষ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার!
নীর-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—
ধ্বংস দেশ—মহামারী! —এ শ্মশানে কারে ডাক দাও?
কাণ্ডারী বলিয়া কারে তব-ঘাটে মিনতি জানাও?
সব মরা! —শকুনি গৃধিনী হের ঘেরিয়া সবার
প্রাণহীণ বীর-বপু, উচ্চস্বরে করিছে চীৎকার!
কেহ নাই! —তরী'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও!

ছল-ভরা কলহাস্যে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
ঈর্ষ্যার অজস্র ফণা, অর্দ্ধমগ্ন শবের দশনে
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায়—
তবু পার হ'তে হবে বাঁচাইতে হবে আপনায়!
নগ্নবক্ষে, পাল তুলি' একমাত্র উত্তরী-বসনে,
ধর হাল—বদ্ধ করি' করাঙ্গুলি, আড়ষ্ট আনীল!"

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৩ পৌষ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি:

" 'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে।···

"তারুণ্য নিয়ে যে একটা হাস্যকর বাহবাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো-আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো-আধো কথা নিয়েই গর্ব ক'রে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা", তখন বুঝতে পারি কচি ডাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেচে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে, স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা

খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে অস্থানে বাহাদুরী করে বেড়ায়, "আমরা তরুণ, আমরা তরুণ!" ক'রে আকাশ মাত ক'রে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে. বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে, যে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য বলে গণ্য করিনে। চিরকাল দেখে এসেছি তরুণ স্বর নিজেকে তরুণ ব'লে কম্পান্বিত করে দেখায়, তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।—আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হয়ে উঠল, সে নিজেকে ভুলচে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখচে যে, সে টনটনে তরুণ, বিষ ফোড়ার মত দগদগে তার রঙ। শুধু তাই নয়, তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপক পাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চলচে। এর মধ্যে কৌতুকের কথাটা হচ্চে এই যে, তারুণ্যটা হল বয়সের ধর্ম্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্য রুষীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ করে কাউকে এগজামিন পাশ করতে হয় না,—বিধাতার বিধানে ঐ বয়সটাতে মানুষ আপনিই আসে। কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ডিগ্রীধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের থীসিস লিখতে সুরু করেচে। তারা বলচে আমরা তরুণ-বয়স্ক বলেই সবাই আমাদের সমস্বরে বাহবা দাও,—আমরা যুদ্ধ করেচি বলে না, প্রাণ দিয়েচি বলে না, তরুণ বয়সে আমরা যা ইচ্ছে-তাই লিখেচি বলে। সাহিত্যের তরফে বলবার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েচে সাহিত্যের আদর্শ থেকে তাকে হয় ভাল নয় মন্দ বলব, কিন্তু তরুণ বয়সে লেখার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া করতে হবে এ তো আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। বাংলা দেশে সাহিত্যের বিচারে দুই-জাতের আইন, দুই-জাতের জুরি রাখতে হবে, একটা হচ্চে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লেখক-দের জন্যে, আর একটা বাকি সকলের জন্যে. এই বিধানটাই পাকা হবে নাকি? এখন থেকে লেখকদের কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে লেখার ভাল মন্দ ঠিক করতে হবে? কোনো তরুণ-বয়স্কের লেখার নির্লজ্জতা দোষ

ধরলে নালিষ উঠবে যে, সেটাতে কেবলমাত্র লেখার নিন্দা করা হল না, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত তরুণ আছে সবাইকেই গাল দেওয়া হোলো !···সাহিত্যে বড়ো-ছোটোর ভেদ আছে, মূল আদর্শে ভেদ নেই। যার কলমেই সাহিত্যিক শক্তি দেখতে পাব তার কলমের কাছেই সাহিত্যিক দাবী করব—এই দাবীর দ্বারাই সাহিত্যের আদর্শ জোর পায়।

"সাহিত্যের দোহাই ছেড়ে দিয়ে সমাজহিতের দোহাই দিতে পার। আমার নিজের বিশ্বাস, "শনিবারের চিঠি"র শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্চে। যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গীর দ্বারা নিজের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত ক্ষণজীবীদের আয়ু এতে বেড়ে যায়। তাও যদি না হয়, তবু সম্ভবত এ'তে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আইনে প্রাণদণ্ডের বিধান আছে, প্রাণ হত্যাও থামচে না।

"ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবী আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান,—নব-নব হাস্যরসের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তি বিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়।···

"আর একটা কথা যোগ করে দিই। যে সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেচে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।"

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'তে —১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘে। এখানে বলে রাখা ভাল, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন

নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সজনীকান্ত হয়েছেন কর্মাধ্যক্ষ।

বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি', ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘে, মন্তব্য করেছে : "হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'তে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ পত্রিকায় তাঁহার এই চিঠিখানি কোনোদিন ছাপা হইবে এমন বিশ্বাস তাঁহার নিশ্চয় ছিল ; তাই তাঁহার ভাষা ঐ পত্রিকার সঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া তদনুযায়ী অসংলগ্ন ও অসংযত হইয়া উঠিয়াছে। সবচেয়ে মজার কথা এই যে রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র কুৎসিত ও জঘন্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে 'আর্ট' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন! তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার নিকট হইতে আর্টের এ হেন নবতন সংজ্ঞা পাইয়া আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। মনে হয়, অন্ধ স্তাবকতায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ও বিচারশক্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

ইতিমধ্যে সজনীকান্তের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার ফলে জল অনেক নিচ পর্যন্ত গড়িয়েছে।

ঘটনাটা গোড়া থেকে বলা দরকার।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ' নামে একখানা গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়েছে। 'নটরাজ' সজনীকান্তের ভাল লাগেনি। তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রবন্ধে 'নটরাজে'র সুদীর্ঘ নিন্দাবাদ আছে। সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিনে—পর পর পাঁচ সংখ্যায় সজনীকান্তের সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ; স্বনামে নয়, 'অরসিক রায়' নামের আড়ালে আত্মগোপন করে সজনীকান্ত সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি ছাপিয়েছেন।

কিন্তু আত্মগোপনের চেষ্টা সার্থক হয়নি। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ পর পর দুদিন—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৫ পৌষ ও ২৬ পৌষ—সজনীকান্তকে ধরে বিশ্বভারতী আপিসে নিয়ে গেলেন। পর পর দুদিন প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে সজনীকান্ত জানতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং জল অনেক নিচ পর্যন্ত গড়িয়েছে।

সজনীকান্ত, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৭ পৌষ, সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখেছেন :

"সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র কয়েক সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আপনার 'নটরাজ' গীতিনাট্যখানির সমালোচনাটি লইয়া কিছুদিন যাবৎ গোপনে ও প্রকাশ্যে একটু আন্দোলন চলিতেছিল পরম্পরায় তাহার আভাস পাইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার কিছু জবাবদিহি করিবার আছে কি না ভাবিয়া তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া এতকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই বা পত্র লিখি নাই। কিন্তু গত পরশু ও কাল প্রশান্তবাবুর সহিত দুই একটি কথাবার্তার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, অবিলম্বে আপনার নিকট আমার নিজের দিকটা খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক, নতুবা আমার সহিত অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জড়াইয়া অকারণে তাহাদের ক্ষতি করার চেষ্টা চলিতে পারে।

"সমালোচনাটি আমার লেখা। অরসিক রায়ের নামের আড়ালে আমি যে-কারণেই আত্মগোপন করিয়া থাকি, ভাবিয়াছিলাম ওই নামটিই ওই প্রবন্ধটি সম্পর্কে অন্য আলোচনার অবকাশ দিবে না। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি বাংলা দেশে লেখার দ্বারা লেখার বিচার হয় না, লেখকের কুলজীকোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়। এ দেশের লোকেরা সত্য অনিসন্ধিৎসু, গোপনতম সত্যটি তাহারা টানিয়া বাহির করিবেই ; কারণ কোন বিশেষ বস্তুর উপর স্বকপোলকল্পিত বিশেষ উদ্দেশ্যটি আরোপ করিতে না পারিলে তাহাদের সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখান হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। ··

"আমি শুনিয়াছি আপনি এই লেখাটি সম্পর্কে একাধিক পত্র পাইয়াছেন, তাহার একটিতে নাকি লেখা আছে আমি অপরের প্ররোচনায় প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম,···ইহাও কেহ বলিয়া থাকিবেন যে, যেহেতু আমি 'প্রবাসী' অফিসের বেতনভোগী কর্মচারী এবং যেহেতু 'বিচিত্রা' পত্রিকাটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই হেতু

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দিয়া এই প্রবন্ধ লিখাইয়া 'বিচিত্রা'কে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাকে জানাইতেছি যে আমার লিখিত উক্ত সমালোচনাটিতে সত্য, মিথ্যা, বাতুলতা, প্রলাপ, ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা যাহা কিছু আছে তাহা সম্পূর্ণ আমার, অন্য কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র প্ররোচনা বা অংশ নাই।···

"যে রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বেনামীতে 'মেঘনাদ বধে'র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, যিনি বয়সের হিসাব ভুলিয়া গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র-নাথ, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত সত্যের খাতিরে দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর নন কো-অপারেশন আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী নৈতিক ভয় দূর করিবার জন্য "সত্যের আহ্বান" করিয়াছিলেন, তিনিই যদি আজ কাহাকেও স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করিতে দেখিয়া গোপন অনুসন্ধান ও হীন চরবৃত্তির প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।···বাংলাদেশের মানুষকে আপনি ৬৭ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন, আমার ভয় হয়, পাছে যাহারা নিরন্তর আপনাকে ঘিরিয়া থাকে, তাহাদের ফেরে পড়িয়া আপনি ভুল করেন।···

"আমার এই ২৬ বৎসরের জীবনে মানুষকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পাই নাই, সুতরাং ভুল করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি বহু বর্ষ যাবৎ এই পৃথিবীর হালচাল দেখিয়া আসিতেছেন, আপনি ভুল করিবেন না, এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি। আপনার অনেক ভক্ত আছে। কেহ কাছে থাকিতে পায়, কেহ পায় না। দূরে যাহারা থাকে তাহাদের ভক্তি বিন্দুমাত্র কম নহে। অন্তত, আমার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ এবং এতকাল খোরাকও রবীন্দ্রনাথই যোগাইতেছেন। আমার ভক্তি বা শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন তাহা হইলেই আমার চরমতম শাস্তি ঘটিবে। আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া অন্তত সেই শাস্তিটুকু হইতে আমাকে রেহাই দিবেন।"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৭ পৌষ, সজনীকান্তকে

একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করি : "নিঃসন্দেহ আমার দীর্ঘকালের কাব্যরচনায় মন্দ লেখা বিস্তর আছে। সেইগুলির উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া ইতিপূর্বে তুমি কখনো লেখ নাই। সম্প্রতি যদি আমার কোনো লেখা মন্দ হইয়া থাকে সেটা কি পাঁচখানা কাগজ ভরাইবার মতো এতই অসহ্য মন্দ? এ সম্বন্ধে তোমার মত যদি আমাকে লিখিয়া জানাইতে, আমার কৈফিয়ৎ আত্মীয়ভাবে তোমাকে জানাইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মশক্তিতে তোমার সহিত পাল্লা দিতে পারি না, সে কথা তুমি জানো। এমন অবস্থায় ছাপার কাগজের উচ্চাসনে গুপ্তভাবে বসিয়া আমার প্রতি সরাসরি বিচারে যথেচ্ছ দণ্ড বিধান করা তোমার পক্ষে সহজ কিন্তু এমন কাজ তুমি করিতে পারো তাহা সন্দেহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।"

সজনীকান্তের 'প্রবাসী'র চাকরি তাঁর আত্মীয়েরা পছন্দ করেননি। তাঁরা বলতেন—পারমার্থিক উন্নতি যতই হোক, ওই চাকরিতে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

এই সময়ে মহাকরণিকে বাংলা অনুবাদক-পদের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে আত্মীয়েরা আর সজনীকান্তকে স্বস্তিতে থাকতে দিলেন না। দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্র দরকার। অনায়াসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসাপত্র পাওয়া গেল। বন্ধুরা বললেন—এতৎসহ রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে সামান্য কিছু যুক্ত হলে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং সজনীকান্ত লজ্জার মাথা খেয়ে একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রশংসাপত্র প্রার্থনা করলেন। অবিলম্বে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্র সজনীকান্তের হাতে এসে গেল। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রের তারিখ—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৩০ মাঘ; ইংরেজি হিসেবে ১৯২৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। এই ঘটনার প্রায় সিকি শতাব্দী পর সজনীকান্ত লিখেছেন: "কবির সহৃদয়তায় ও বদান্যতায় মরমে মরিয়া গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিয়া ফেলিলাম, রবীন্দ্রনাথের

প্রশংসাপত্রের অপমান ঘটিতে দিব না, সরকারী ভাল চাকুরি মাথায় থাক। সুতরাং ১৯২৮ সনের দরখাস্ত আজও পর্যন্ত অ-প্রেরিতই রহিয়া গিয়াছে, 'প্রবাসী'র মায়া কাটাইব কাটাইব করিয়াও তখন কাটাইতে পারি নাই। এই আত্মঘাতী সঙ্কল্পের দ্বারা আমি যে কবিকে কতখানি সম্মান করিলাম তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না। তাঁহার সহিত আমার দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ রহিয়াই গেল, এদিকে আত্মীয়েরাও আমার প্রতি বিরূপ হইলেন।"

আবার রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্মে'র কথায় ফিরে যাই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম কি একান্ত নিরর্থক ও অন্তঃসারশূন্য? বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি', ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘে, মন্তব্য করেছে: "রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই হ'ন, সাহিত্যে তাঁহার দানই চরম দান—এ কথা তাহারাই ভাবিবে যাহারা ভাবে স্থবির ও আদর্শে অনমুপ্রাণিত। তাঁহার সাহিত্যঘোষণা যত দূরগামীই হোক না কেন তাহা সমস্ত লেখকের পক্ষেই স্থির ও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। বিশেষ বিশেষ লেখকের আত্মানুভূতির কাছে তাঁহার সাহিত্যধর্ম্ম একান্ত নিরর্থক ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে; তাহাতে চমকাইবার কিছুই নাই। কোনো ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন নয়,—সাহিত্যধর্ম্মও নয়। দেশে দেশে যুগে যুগে তাহার বিভিন্ন প্রকাশ দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধে যদি কোথাও সন্দেহ জন্মিয়া থাকে এবং সেই সন্দেহ যদি সাহিত্যের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়, সেটা আমরা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়াই মনে করিব। কেননা সাহিত্যের রাজত্বে একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া কাহারও স্থান নাই, তাহার অনুশাসন সর্ব্বকালেই শিরোধার্য্য নহে। 'পথ ছাড়িয়া দিব না' এ বড়াই যেখানেই চলুক, সাহিত্যে চলে না। পথ কি কেহ কাহাকে ছাড়িয়া দেয়? —পথ হইতে সন্তর্পণে সরিয়া যাইতে হয়।"

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম্মে'র জের হিসেবে তর্ক-বিতর্কের ঘোরতর

আন্দোলন বহুদিন চলেছে। 'শনিবারের চিঠি'র তরফ থেকে চিরন্তন সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে নিজস্ব সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২০ ফাল্গুন, একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি : "তর্ক-বিতর্কের যে ঘোরতর আন্দোলন চলচে তাতে আরো ঠেলা মারতে ইচ্ছে করে না। আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েচে, যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্মুখের মুখোশ প'রে আমাকে ভয় দেখাচ্চে তা হ'লে তো মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট-ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই—চতুর্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কতদিনের।"

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের 'কালি-কলমে' বিরূপাক্ষ শর্মার 'আর্টের আটচালা' নামক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি : "কবিগুরু 'শনিবারের চিঠি'কে কোল দিয়েছেন। চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে কোল দেওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত পতিতোদ্ধারের এমন প্রাণমাতান উদাহরণ আর বোধ করি পাওয়া যায় নি। কিছুদিন পূর্ব্বেই 'আত্মশক্তি'র মারফতে 'শনিবারের চিঠি'র অন্যতম পাণ্ডা 'অরসিক' রূপে 'রসের কলসী'র কানা ছুঁড়ে রবীন্দ্রনাথকে কি রকম আঘাত করেছিলেন সে সংবাদ বোধ হয় অনেকেই জানেন। তারপরেও এই স্নেহের অভিব্যক্তি। এবারে তাঁর স্নেহের বন্যায় 'সাহিত্য যে ডুবুডুবু, আর্ট ভেসে যায়।'…"

'কশ্চিৎ মৃত-জীবিত বৃদ্ধ' একখানা চিঠি লিখেছেন 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদককে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্রের 'কল্লোলে' চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিখানা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি :

"আপনারা সহসা দেখছি কলকাতার সাহিত্যিক-মহলে, অথবা বাংলা সাহিত্য-মহলে বেশ সোরগোল তুলেছেন। আমার মনে হয়, এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের বাজারে এত গোলমালের

স্বস্তি বোধ হয় আর হয়নি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে, মহাশয়, বড়ই বিপদে পড়েছি—কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা এমন কিছুই ভাল লেখেন নি যাতে সহসা বাংলা-সাহিত্যের একটা নতুন দিক খুলে গেছে—তাহলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ তাঁহার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আপনাদের কোথাও না কোথাও স্বীকার করতেন।…

"লোকমুখে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনুরুদ্ধ হয়েও অস্ত্র ধারণ করেন নি। 'সাহিত্যিক স্বল্পায়ুদের' আঘাত করতে তাঁর সবল হস্ত চিরদিন অনুকম্পায় শিথিল হয়ে উঠতো। এবং তাই তো ক্ষাত্রধর্ম্ম। কাল যাদের অঙ্গে আপনার অমোঘ আঘাত এঁকে দিয়ে গেছে কোন বীরপুরুষ জগতে আছে যে, আবার তার অঙ্গে আঘাত করবে? মৃতকে আঘাত করা কি বর্ব্বরতা নয়?…

"রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়া আপনাদের ওপর নেই, এতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আপনাদের সাহিত্যে অভিনবত্ব কিছুই নেই, থাকলে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো না।

"বাংলা-সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক লেখা যে আর্ট হয়ে উঠেছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। যথাসময়ে তিনি তাকে যথাভাবে স্বীকারও করেছেন।…

"…'শনিবারের চিঠি'কে তিনি আর্ট পদবীতে উন্নীত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পড়ে পুরাতন 'শনিবারের চিঠি' সংগ্রহ করে পড়ে দেখলাম এবং কয়েকজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও আলাপ করলাম। এই জঘন্য কুৎসা ও ব্যক্তিগত গালিগালাজকে তিনি কি করে আর্ট বললেন, তা ভেবে পাচ্ছি না। …অথবা এইটেই বুঝতে হবে যে, পরনিন্দা ও কুৎসা তখনই আর্ট হয়ে ওঠে, যখন আঘাতের অংশ নিজেকে বাদ দিয়ে অপরের দিকে যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ রকম ভাবা ও আলোচনা করা বড়ই অশোভন হয়ত আপনি বলবেন এবং এটা যে অশোভন আমিও তা জানি; কিন্তু সত্যই মন সন্দিগ্ধ হয়ে

উঠেছে,—আপনারা সমাজের সাহিত্যের কি মহা-অনিষ্টই করছেন, আর কল্কি-অবতাররূপে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসার কৃপাণ হস্তে যারা বাংলা-সাহিত্য উদ্ধার করতে এসেছেন তাঁরা সত্যই কি মহা-ইষ্ট সাধন করেছেন।"

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে সাহিত্য-আলোচনা সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৪ চৈত্র। প্রথম অধিবেশনে 'কল্লোলে'র দল উপস্থিত, 'শনিবারের চিঠি'র দল অনুপস্থিত। সেদিন রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবাসী'তে—১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে ঈষৎ অংশ উদ্ধৃত করি :

"সম্প্রতি সাহিত্যের যুগ যুগান্তর কথাটার উপর অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে "যুগ" ব'লে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্নওয়ালা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে,—বোঝাই সারা হ'লে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার পরে আবার নতুন মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়।

"সাহিত্যের যুগ বলতে কি বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েচে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে? এই রকমের কোনো-একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তর-কে সৃষ্টি করা যায় একথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিষ আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাসপরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো-একটা চাপরাসের জোরে যে-সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায় জানব তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে ব'লেই চাপরাসের দেমাক বেশি হয়।"

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে

সাহিত্য-আলোচনা সভার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৭ চৈত্র। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'কল্লোলে'র দল ও 'শনিবারের চিঠি'র দল—দু-দলই উপস্থিত।

তখনকার যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন কিংবা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলেন।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমি জানি আমি কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে উপলক্ষ করে লিখিনি। কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম বিগর্হিত মনে হয়েছিল; তাতে সমাজধর্মের যদি কোনও ক্ষতি করে থাকে—সমাজরক্ষার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা সে-বিষয়ে চিন্তা করবেন; আমি সেদিক থেকে কখনও আলোচনা করিনি।..."

দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে 'প্রবাসী'তে—১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে ঈষৎ অংশ উদ্ধৃত করি: "যে সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হ'তে পারতো যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েছে তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষ সঞ্চার হয়েছে। এই মনের আক্ষেপ নিয়ে হয় তো কিছু বলে থাকব। বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নাই; অসংযত ভাবে তাঁরা যা বলেন সেটা তখনকার Democratic সাহিত্যে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে হবে, তা হ'লে বলতে হবে তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। যদি কেউ বলেন, আমরা সে দলের নই আমি খুসী হব।"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেদিন রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন—সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আপন বক্তব্য বলেছেন ; তাঁর বক্তব্যের শেষ দুটি বাক্য উদ্ধার করি : "সমাজ-ব্যবস্থার জন্য বাঁধাবাঁধি যে নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু যে সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্ম্মগত সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না ইত্যাদি, সেগুলির ব্যতিক্রম কোনো-কালে হ'তে পারে ব'লে মনে করি না।"

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছেন—কিন্তু তরুণরা এই যে লিখেছেন, ভগবান প্রেম আর ভূত মানি না, সাহিত্যে তার স্থান আছে কি ?

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শের কথা বলেছেন।

একজন তারপর রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছেন—আপনি সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শের কথা বললেন। সমালোচনারও এ-রকম কোনও আদর্শ আছে কি না। সাহিত্য-সমালোচনায় লগুড় ও ব্যক্তিগত গালাগালিই যদি একমাত্র জিনিস হয় তাহলে সেটা সাহিত্যের পক্ষে হিতজনক কিনা।

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছেন :

"এটা সাহিত্যিক-নীতি বিগর্হিত। যে সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবল মাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিষ আছে যা বস্তুতঃ নিষ্ঠুরতা—এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিক ভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময়ে, টুকরো করতে গেলেই এক জিনিষ আর এক হ'য়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে-ছবি আছে পটটাকে ছিঁড়ে তার বিচার করা চলে না—অন্তত সেটা আর্টের বিচার নয়।

"সুবিচার করতে হ'লে যে-শান্তি মানুষের থাকা উচিত সেটা রক্ষা ক'রে আমরা যদি আমাদের মত প্রকাশ করি তা হ'লে সে মতের

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN BENGAL

কল্যাণীয়েষু

দুখানা সন্দেশ পেয়েছি। বিশেষ [illegible] [illegible]।
এখন ছুটির সময় আর পাঠাতে হবে না। যদি [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। — [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

বুদ্ধদেব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাঁকে ঠাণ্ডা করতে যাব, যে সাহস এই বুড়োর, সবার আগে ফিরে [illegible] গেছে। দিলীপ দুঃখিত। সুধী হতাশ। অতএব অমিয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ইতি [illegible] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রভাব অনেক বেশী হয়। বিচারশক্তির প্রেসটিজের চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের গভর্নমেণ্টের কোনো কোনো ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তার মতে শাসনের প্রবলতা প্রমাণ করবার জন্যে মারের মাত্রাটা ন্যায়ের মাত্রার চেয়ে বাড়ানো ভালো। আমরা বলি সুবিচার করবারই ইচ্ছাটা দণ্ডবিধান করবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।"

সজনীকান্ত প্রশ্ন করেছেন—এখানে যে আলোচনা হচ্ছে সেটা সম্ভবত 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—হাঁ, 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই কথা হচ্ছে।

তারপর 'শনিবারের চিঠি'র আদর্শ, আধুনিক সাহিত্যিকদের সৃষ্টি আদপে সাহিত্য কিনা ইত্যাদি বিষয়ে নানাভাবের আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ সেদিন আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন:

"যে জিনিষ বরাবর সাহিত্যে বর্জ্জিত হ'য়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় ক'রে দেখান এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্দ্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলচেন এসব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলবো, প্রতিক্রিয়া কখনই প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হ'তে পারে না। যেমনতর কোন সময় বাতাস গরম হ'য়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না, এর পর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।

"ঈশ্বরকে মানিনে, ভালবাসা মানিনে, সুতরাং আমরা সাহিত্যে বিশেষ কৌলীন্য লাভ করেচি এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হ'তে পারে না। ঈশ্বরকে মানি না বা বিশ্বাস করি না সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়? ভালবাসা মানছি না, অতএব বাস্না

ভালবাসা মানে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্যপ্রসঙ্গে একথা ব'লে লাভ কি ?"

রবীন্দ্রনাথ সেদিন 'শনিবারের চিঠি' সম্বন্ধে বলেছেন :

" 'শনিবারের চিঠি' যদি সাহিত্যের সীমার মধ্যে থেকে বিশুদ্ধভাবে সম্পূর্ণভাবে সমালোচনার পথে অগ্রসর হন, তা হ'লে বেশী ফললাভ করবেন এই আমার বিশ্বাস। যদি একান্ত ভাবে দোষ-নির্ণয় করবার দিকে সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করি তা হ'লে সেটা মাথায় চেপে যায়, তাতে শক্তির অপচয় ঘটে। শনিবারের চিঠিতে এমন সব লোকের সম্বন্ধে আলোচনা দেখেচি যাঁরা সাহিত্যিক নন এবং জনগণের মধ্যেও যাঁদের বিশেষ প্রাধান্য নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে অতি প্রকট ক'রে যেসব ছবি আঁকা হয় তাতে না সাহিত্যের না সমাজের কোনো উপকার ঘটে। এর ফল হয় এই যে, যেখানে সাধারণের হিতের প্রতি লক্ষ্য ক'রে লেখকেরা কঠিন কথা বলেন তার দাম কমে যায়। মনে হয় কঠিন কথা বলতেই লেখকের বিশেষ আনন্দ, তাঁর লক্ষ্য যেই হোক আব যাই হোক।

"কর্ত্তব্য-পালনের যে অবশ্যম্ভাবী কঠোরতা আছে নিজেরও সম্বন্ধে সেটাকে অত্যন্ত দৃঢ় রাখা চাই। শনিবারের চিঠির লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনানৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি ; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্য্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্যসংস্কার কার্য্যে তাঁদের কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র আছে---কিন্তু কর্ত্তব্যটি অপ্রিয় ব'লেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদেরকে একান্ত ভাবে রক্ষা করতে হবে। অস্ত্র-চিকিৎসায় অস্ত্র চালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কেন না, আরোগ্য বিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের চিকিৎসাই শনিবারের চিঠির লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটু মাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে অস্ত্রচালনার কৌশলই

একমাত্র জিনিষ নয়, প্রতিপত্তিও মহামূল্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা ক'রে শনিবারের চিঠি যদি কর্ত্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাঁকে কেউ নিন্দা করতে পারবে না। যাঁদের শক্তি আছে তাঁদের কাছেই আমরা যথাস্থানে ক্ষান্তি দাবী করি। কর্ত্তব্য যেখানে বড়ো সেখানেই তার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ শুচি রক্ষার প্রয়োজন।"

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'প্রবাসী'-প্রেসের দীর্ঘকালের ম্যানেজার ও মুদ্রাকর অবিনাশচন্দ্র সরকার চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশোক চট্টোপাধ্যায় সরাসরি সজনীকান্তকেই ওই পদে বহাল করলেন—মাইনে একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা। পরে এই মাইনে বেড়ে একশ সত্তর টাকা হয়েছে—'প্রবাসী'তে সজনীকান্তের মাইনের হিসেব এখানেই শেষ করে রাখা গেল।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পাদক নীরোদচন্দ্র একটি বেনামী প্রবন্ধ লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে; প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ ব্যাজস্তুতিমূলক। ফলে চতুর্দিকে বিরূপ আলোচনা ও কটূবাক্যের ঝড় উঠেছে। সেসব উপেক্ষা করে সজনীকান্ত, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠি'তে, প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন; প্রবন্ধটিতে ঔদ্ধত্য ও ইয়ার্কির অসম্মান আছে। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত নীরদচন্দ্রের আরেকটি প্রবন্ধ যথেষ্ট মারাত্মক। খুব স্বাভাবিক, 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে বিপক্ষদলের আক্রমণ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। 'শনিবারের চিঠি'ও সংযত থাকতে পারেনি। প্রথম চৌধুরী সম্পর্কে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত একটি প্রবন্ধ লিখেছেন; হালকা ইয়ার্কি এবারে গভীর অসম্ভ্রম হয়ে উঠেছে।

প্রথম চৌধুরী, সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের জামাতা; শুধু তাই নয়, বন্ধু ও ভাষায় তখন সমানধর্মী বলে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ-সমীহ করেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র বাড়া-

বাড়ি দেখে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন ; এতদূর ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ যে সম্মানের উপহার অর্থাৎ কমপ্লিমেণ্টারি 'শনিবারের চিঠি' স্বহস্তে 'রিফিউজড' লিখে ফেরত পাঠিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই বিমুখতায় 'শনিবারের চিঠি' শঙ্কিত বা লজ্জিত হয়নি ; বরং প্রমথ চৌধুরীকে অপদস্থ করবার জন্য আরও নির্মম হয়ে উঠেছে।

'শনিবারের চিঠি'র কথা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে 'পথের পাঁচালী'র কথায় চলে যাই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'বিচিত্রা'য় ; প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বিভূতিভূষণ একদিন 'প্রবাসী'-কার্যালয়ে 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় এলেন। বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে সেদিন কেউই বিশেষ উৎসাহী হননি। 'পথের পাঁচালী' তখনও 'বিচিত্রা'য় শেষ হয়নি, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। 'বিচিত্রা'র দু-একটি খুচরো সংখ্যায় সজনীকান্ত চোখ বুলিয়ে 'পথের পাঁচালী' দেখেছেন, মন দিয়ে পড়েননি।

কথায় কথায় নীরদচন্দ্র বললেন—'পথের পাঁচালী'র মতো উপন্যাসের একজন ভদ্র প্রকাশক জুটল না, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যের কথা।

কথাটার আসল অর্থ সজনীকান্ত ঠিকমতো বুঝতে পারলেন না।

আড্ডার শেষে বিভূতিভূষণ বিদায় নিলেন।

সজনীকান্ত 'বিচিত্রা'র ফাইল যোগাড় করলেন ; গভীর রাত্রি পর্যন্ত 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশিত অংশ পড়লেন ; বিস্ময়-বিমুগ্ধ হলেন ; বিভূতিভূষণের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়লেন ; স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে অভিনবের আবির্ভাব হয়েছে। উত্তেজনায় সজনীকান্ত প্রায় বিনিদ্র কাটালেন শেষরাত্রি।

পরদিন ঠিক দশটার সময় সজনীকান্ত আপিসে এসে নীরদচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—'পথের পাঁচালী'র প্রকাশক পাওয়া যায়নি—এ-কথাটার অর্থ কি ?

নীরদচন্দ্র জানালেন যে একজন প্রখ্যাত প্রকাশক মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট কিনতে চেয়েছেন, আরেকজন প্রখ্যাত প্রকাশক বই ছেপে বিক্রি হলে কিঞ্চিৎ রয়ালটি দিতে পারেন বলেছেন।

অকস্মাৎ সজনীকান্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়ে বললেন—যদি বিভূতি-বাবু রাজী হন, আমিই 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশক হব।

সজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা তখন এমন নয় যে তিনি 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশক হতে পারেন। নীরদচন্দ্র সেকথা জানেন; সুতরাং তিনি অবাক হয়ে বললেন—যদি সকল দিক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন, আমি মির্জাপুরের মেসে গিয়ে বিভূতি-বাবুকে নিয়ে আসছি। ওঁর সঙ্গে কীভাবে লেখাপড়া হবে, আপনি স্থির করে রাখুন।

নীরদচন্দ্র চলে গেলেন।

আর সজনীকান্ত পরামর্শ করে নিলেন বন্ধু গোপাল হালদারের সঙ্গে। গোপাল হালদার আশ্বাস দিলেন যে দরকার মতো টাকা ধার পাওয়া যাবে।

বিভূতিভূষণ এলেন। সাব্যস্ত হল যে বিভূতিভূষণ ও সজনীকান্তের মধ্যে লেখাপড়া হবে। কিন্তু প্রকাশালয়ের নাম ছাড়া দলিল হয় না। অতএব সেদিন সেই মুহূর্তে দলিল করার আগে নতুন পুস্তক-প্রকাশাল-য়ের নাম রাখা হল—রঞ্জন প্রকাশালয়। দলিলে বিভূতিভূষণ সই করলেন এবং 'রঞ্জন প্রকাশালয়ে'র পক্ষে সই করলেন সজনীকান্ত।

বিভূতিভূষণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ, দেখে গেলেন যে 'পথের পাঁচালী'র প্রথম ফর্মাটা ছাপা হয়েছে।

'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায়, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ, 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হল; সেদিন আড্ডায় উপস্থিত ডঃ

কালিদাস নাগ, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। পরদিন বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখেছেন : "সকলেই ভারী উপভোগ করলেন, এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল করেন, দেখে ভারী আনন্দ হোল সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে।..."

'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৬ আশ্বিন। বিভূতিভূষণ সেদিন সজনীকান্তকে একখানা 'পথের পাঁচালী' উপহার দিয়েছেন—নাম সই করেছেন 'অপু'।

বিভূতিভূষণ কালক্রমে সজনীকান্তের ভালবাসার স্বর্ণসূত্রে বাঁধা পড়েছেন।

আবার 'শনিবারের চিঠি'র কথায় ফিরে যাই।

নানা কারণে নীরদচন্দ্র 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়লেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা থেকে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হলেন সজনীকান্ত। মালিক রইলেন, বলা বাহুল্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রের ও ১৩৩৬বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত 'দীনেশ-নামা' লিখেছেন। সজনীকান্তের 'দীনেশ-নামা'য় দীনেশচন্দ্র সেন ব্যঙ্গবিদ্রূপে আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। 'দীনেশ-নামা' লিখে সজনীকান্ত নিঃসন্দেহে অপরাধ করেছেন।

দীনেশচন্দ্র মারা গেছেন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ৪ অগ্রহায়ণ।

১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে প্রকাশিত হয়েছে সজনীকান্তের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'। এই বইখানা সজনীকান্ত উৎসর্গ করেছেন—শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে; উৎসর্গপত্রে সজনীকান্ত লিখেছেন : "যৌবনের উদ্ধত চাপল্যে একদিন 'শনিবারের চিঠি'তে 'দীনেশ-নামা' লিখিয়াছিলাম, উদারহৃদয় দীনেশচন্দ্র শেষ বয়সে আমাকে ক্ষমা তো করিয়াছিলেনই, আন্তরিক আশীর্বাদও করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবিতকালে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি

নাই, আজ করিলাম।"

'দীনেশ-নামা' প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিন পর সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র মালিক হলেন। সজনীকান্ত, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষের 'শনিবারের চিঠি'তে, নিবেদন করেছেন: "১৩৩৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে অশোকবাবু পুনরায় বিলাত যান, তখন আমিই শনিবারের চিঠির মালিক হইয়া পড়ি; আমার সেই স্বত্ব আজিও বজায় আছে। যাঁহারা ইচ্ছা করিলে আমাকে স্বত্বচ্যুত করিতে পারিতেন তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া তাহা করেন নাই বলিয়াই আজ আমি শনিবারের চিঠির মালিক।"

সজনীকান্তকে একদিন 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আদেশ দিলেন। সজনীকান্ত, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২২ আষাঢ়, দেখা করতে গেলেন। রামানন্দ কোনও কথা না বলে রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠি সজনীকান্তের হাতে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানায় একটি সাংঘাতিক বিজ্ঞপ্তি আছে—প্রবাসী প্রেসে 'শনিবারের চিঠি' ছাপা হতে থাকলে রবীন্দ্রনাথ আর কোনও রকমে 'প্রবাসী'র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

বলা বাহুল্য, 'শনিবারের চিঠি' তখন পর্যন্ত প্রবাসী প্রেসে ছাপা হত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানা পড়ে সজনীকান্ত এমনই অভিভূত হয়ে গেলেন যে বেশী কথা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—বেশ তাই হবে, 'শনিবারের চিঠি' অন্যত্র ছাপব।

অতঃপর 'শনিবারের চিঠি' আর কখনও প্রবাসী প্রেসে ছাপা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সজনীকান্ত তখন খুবই বিচলিত ও আত্মবিস্মৃত; এতদূর বিচলিত ও আত্মবিস্মৃত যে সজনীকান্ত, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তে 'হেঁয়ালি' নামক একটি বর্বর কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি:

"স্বপ্ন ভাঙা নিঝর তোমার এই কি ছিল ললাটে,
মনের লেখা পড়লে না ক দেখলে শুধু মলাটে!
দেখলে তবক চকমকানি
পোষা টিয়ার বকবকানি
শুনলে শুধু, সন্ধ্যা-ছায়ায়
চক্ষু তোমার ঘোলাটে!
খাইনি ব'লে তুমিও খাও ঠাকুর ঘরের কলাটে!

ছন্দ-পতন হয় কি না হয় বন্ধ করে লেখনী,
শৃগাল-কুকুরের ডাক ভুলিয়া, হিসাব ক'রে দেখনি!
কান কি তোমার সে কান আছে?
বেসুর স্তুতি কানের কাছে
অহরহ শুনছ প্রভু,
সাচ্চা ঝুটা শেখনি!
সন্দেহ হয়, মন্দ আরো তোমার ললাট-লেখনই!

পরের মুখে ঝাল খেয়েছ, পরের কথা শুনিয়া,
স্তাবক-তুষ্ট হে মহারাজ, হঠাৎ হ'লে খুনিয়া!
লেলিয়ে পুলিশ পালিয়ে গেলে
কেউটে কভু হয় না হেলে!
ভাবের বিশ্ব উঠল ভ'রে,
নিঃস্ব মাটির দুনিয়া,
ধনুক-ছিলা ছিঁড়ল হঠাৎ স্বপন-তুলা ধুনিয়া!

স্বদেশ তোমায় চিনলে না ক এইটে হ'ল হেঁয়ালি,
ভাবছ বুঝি, বিদেশ করে তোমার যশের দেয়ালী!
সে ভুলও শিব, ভাঙবে তোমার,

সেক্সপীয়ার ও গ্যেটে হোমার,
রবেই বেঁচে, বলবে তখন
এরাও কুকুর-শেয়ালই !
স্বদেশ স্মরি কাঁদবে তখন থাকবে না আর খেয়ালী !

শ্মশান-শিবে ধরল ছেঁকে পোষা শেয়াল কুকুরে,
শিব দেখিছে আপন ছায়া তাদের চোখের মুকুরে !
তারাই শুধু বুঝল হা রে,
তাঁর প্রতিভা তপস্যারে,
কুকুর নিয়ে মত্ত মহেশ,
প্রভাত-সন্ধ্যা-দুকুরে,
সাগর-সেঁচা সূর্য্য—সে কি অস্ত যাবে পুকুরে ?"

'হেঁয়ালি'র ভীষণ আঘাত রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেছে। পরবর্তী-কালে সজনীকান্ত লিখেছেন: "অরসিক রায় বেনামীতে 'নটরাজে'র সমালোচনার গ্লানি মনে সঞ্চিতই ছিল, এই কবিতার দরুন তাহা দ্বিগুণিত হইল। সে সংবাদও যথাসময়ে পাইলাম।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুনীতিকুমারের শ্রদ্ধা অসীম, সজনীকান্তকেও তিনি কম ভালবাসেন না। সজনীকান্তের পক্ষে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ওকালতি করতে গেলেন। ফল ভাল হল না। রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১১ পৌষ, সুনীতিকুমারকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: "সেদিন তোমার সঙ্গে যে কথার আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা এইখানে বলে রাখি। তুমি বলেছিলে শনিবারের চিঠিতে যাঁরা আমার অবমাননা করেছেন তাঁরা আমার ভক্ত, কেবল বিশেষ কোন ব্যক্তিগত কারণেই তাঁরা আমাকে আক্রমণ করে ক্ষোভ নিবৃত্তি করেছেন। কিছুকাল থেকেই এটা দেখেছি ব্যক্তিগত কারণ ঘটবার বহুকাল পূর্ব হতেই তাঁরা আমার নিন্দায় আনন্দ ভোগ করে এসেছেন। এটা

দেখেছি যাঁরা কোনদিন আমার লেখার কোন গুণ ব্যাখ্যা করবার জন্যে একছত্রও লেখেন নি তাঁরাই নিন্দা করবার বেলাতেই অজস্র ভাবে বহু পল্লবিত করে লিখেচেন। সকল লেখকের রচনাতেই ভাল-মন্দ তুইই থাকে কিন্তু ভালটার সম্বন্ধে নীরব থেকে মন্দটাকেই দীর্ঘ-স্বরে ঘোষণা করার উৎসাহ শ্রদ্ধার লক্ষণ নয়। মোটের উপর যাকে আমরা নিন্দার্হ বলে জানি তার সম্বন্ধেই এরকম আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এরকম ব্যবহারকে নিন্দা করা যায় না। কেননা সকলেই আমার রচনা বা চরিত্রকে প্রশংসনীয় বলে মনে করবে এরকম প্রত্যাশা করাও লজ্জার কথা। বাংলা দেশে আমার সম্বন্ধে এমন প্রত্যাশা করার হেতুই ঘটে নি। এঁরাই কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে থাকেন যে স্তাবকবৃন্দ আমাকে বেষ্টন করে সর্বদা যে স্তব-কোলাহল করে থাকেন তার দ্বারাই নিজের ত্রুটিবিচারে আমি অক্ষম। এঁরা নিজে আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকেন না, যাঁরা থাকেন তাঁরা কী করেন সে সম্বন্ধে এঁদের অনভিজ্ঞ কল্পনা আমার প্রতি প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দেয়। ....আমার বক্তব্য এই যে অসঙ্কোচে যাঁরা আমার নিন্দা করতে আনন্দ পান তাঁদের সংখ্যা অনেক এবং আমি তাঁদের দোষ দেব না, কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান একথা বলা চলবে না।"

রবীন্দ্রনাথ এই একান্ত ব্যক্তিগত পত্রের একটা নকল সজনীকান্তের কাছেও পাঠিয়েছেন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকের 'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশ নির্লজ্জ-ভাবে বিলম্বিত হয়েছে—১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়েছে। সজনীকান্ত, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত, 'ভ্রান্তি' নামক একটি সুদীর্ঘ কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে খোঁচা দিয়েছেন। 'ভ্রান্তি' থেকে মাত্র তুটি স্তবক উদ্ধৃত করি :

"জ্বলিতেছে, তবু ধাতব সূর্য্য
তুঃখ এই!

মিথ্যা একথা—তাঁর প্রতি দেশে
শ্রদ্ধা নেই
আপন করিতে জানে যেইজনা—
তারি পায়ে সবে বিকায় আপনা ;
'হব না আপন' যাঁহার সাধনা

আপন করিতে পারে নাই কেহ—
সত্য এই !

*   *   *

বৃথা আক্ষেপ !   তুমিই তোমার
উপমা কবি—
আঘাত তোমার কঠিন, কান্না
হৃদয় দ্রবী !
তবু মনে হয় অভিমান মিছে,
আঁধার মাত্র প্রদীপের নীচে !
পূজা-সম্ভার ভক্ত বহিছে—
দেবতা লোভী !
যা পেয়েছ আর পায় নাই কেহ—
মিথ্যা সবই ?"

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর 'শনিবারের চিঠি' বন্ধ হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদপূত 'পরিচয়' পত্রিকা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায়, প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ দিনকয়েকের জন্য দার্জিলিঙে গিয়েছেন। সেখানে কাজী নজরুল ইসলাম একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এবং এ-বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলামের

একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে 'স্বদেশ' পত্রিকায়—১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে। রচনাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

"কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোন রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেমন চমৎকার ফুলঝুরির মত ফুল সেজে থাকে। ···কবি হাসতে হাসতে বললেন, এই রকম আর একটি জীবের নাম করা চলে—দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক ওই কারণে সাহিত্যের আসরে একেবারে একঘরে হয়ে আছে।

"আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।"

'শনিবারের চিঠি'র মলাটে মুরগীর ছবি থাকে। 'সজনে ফুল' ও 'মুরগী' বলে রবীন্দ্রনাথ কি 'শনিবারের চিঠি'কেই ইঙ্গিত করেছেন? কে জানে। কিন্তু সজনীকান্ত ও আরও কেউ-কেউ ভেবেছেন যে 'সজনে ফুল' ও 'মুরগী' বলে রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'কেই ইঙ্গিত করেছেন।

'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে। রবীন্দ্রনাথ তখন সজনীকান্তের প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন; প্রবাসী প্রেস থেকে 'শনিবারের চিঠি' ছাপান বন্ধ হওয়াতেও তাঁর রাগ পড়েনি।

পুনর্জীবিত 'শনিবারের চিঠি' আরম্ভ থেকেই 'পরিচয়' পত্রিকার বিরোধিতা করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র উপর আরও চটেছেন।

'প্রবাসী'র কর্তৃপক্ষ সজনীকান্তের কাছে সরাসরি কখনও কোনও অনুযোগ করেননি বটে, কিন্তু ওখানে চাকরি সজনীকান্তের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। 'প্রবাসী' আপিসে নিজস্ব আসনে বসে সজনীকান্ত, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২০ আশ্বিন, ইস্তফাপত্র লিখে ফেললেন। জেনারেল ম্যানেজারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অশোক চট্টোপাধ্যায় তখন জেনারেল ম্যানেজার। তাঁর গাড়ির আওয়াজ পেয়েই সজনীকান্ত বেরিয়ে এলেন, গাড়ির দরজা খুলে

পাদানে দাঁড়িয়েই তাঁর হাতে ইস্তফাপত্রটি তুলে দিলেন।

এক নজর দেখেই অশোক চট্টোপাধ্যায় বললেন—পাগলামি করো না। চলো, ভেতরে চলো।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কথায় সজনীকান্ত শেষ পর্যন্ত ইস্তফাপত্র ফিরিয়ে নিয়ে বিনা বেতনে ছমাসের ছুটির দরখাস্ত দাখিল করলেন; সঙ্গে সঙ্গে ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল।

সজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়; অশোক চট্টোপাধ্যায় সেকথা জানেন। একটু ধরা গলায় তিনি বললেন—যদি সামলাতে না পারো এখানেই ফিরে এসো, আমি থাকলে তোমার জায়গাও থাকবে।

কিন্তু সজনীকান্ত আর কোনোদিন 'প্রবাসী'তে চাকরি করতে যাননি।

বুদ্ধদেব বসুর ছয়টি কবিতা (ছয়টির মধ্যে কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ) দিলীপকুমার রায় কয়েকটি কাঁচিছাঁটা পাতায় আপন মন্তব্যসমেত রবীন্দ্রনাথকে পড়তে পাঠিয়েছেন; পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ওই রচনাগুলি জলভরা ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত; কবিতা-গুলিতে সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্য ছন্দে ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্যশালী। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'নবীন কবি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে 'বিচিত্রা'য়—১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকে। 'নবীন কবি' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

"কিছুকাল পূর্ব্বে একবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ঢাকায় গিয়েছিলুম তখন বুদ্ধদেব বসুর লেখা একখানি কবিতা আমার হাতে পড়ে। সেই সময়ে তাঁর কিশোর বয়স। মনে আছে লেখাটি প'ড়ে আমার কোন একজন সঙ্গীকে বলেছিলুম, এই কবিতায় ছন্দ ভাষা এবং ভাব গ্রন্থনের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে কেবল কবিত্ব শক্তি মাত্র নয় এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে,

একদিন প্রকাশ পাবে।

অনেক কাল থেকে কাগজপত্র পড়া আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েচি। কেন, সে কথাটা একটু বিস্তারিত ক'রেই বলব। এর কারণ ঔদাসীন্য নয়, ব্যর্থ বিক্ষোভ থেকে নিজেকে বাঁচাবার ইচ্ছা। প্রশংসাবাক্যে খুসি হইনে মনের এমন অসাড়তা ঘটেনি তবু প্রশংসার লালসা থেকে মুক্তি পেয়েচি। কিন্তু সাহিত্যিক রূঢ়তা বা অসৌজন্যকে যাঁরা ডিমক্রাসির শৌর্য্যলক্ষণ ব'লে গণ্য করেন আমি তাঁদের দলের নই। অর্থাৎ শস্যক্ষেতে ফসলের চর্চাকে কাঁটাগাছের স্পর্দ্ধার দ্বারা অবমানিত দেখলে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি।

কিছুকাল থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে কোমর বেঁধে এই কাঁটাগাছের আবাদ চলেচে। যে-জাতের লোকের চরিত্র দুর্ব্বল, তারা মানুষকে পীড়া দিয়েই বাহাদুরী করে। আমাদের দেশে বরযাত্রদের ব্যবহারে বাঙালী বহুকাল থেকে এই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে এসেচে। যে-পক্ষ শত্রুপক্ষ নয়, কেবলমাত্র অপর পক্ষ, তাকে কটুবাক্যে ও উদ্ধত ব্যবহারে উৎপীড়িত অবমানিত করাকে তারা স্বপক্ষের জিৎ বলে মাতামাতি করতে ভালবাসে। কে কাকে দু'য়ো দিতে পারলে এই নিয়ে তাদের আস্ফালন। অর্থাৎ কোন এক পক্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেল এতেই ভারি খুসি। সে-পক্ষ অপরাধ করেচে বলে নয়, সে-পক্ষ আমার পক্ষ নয় ব'লে, এমন কি, তার কোন পক্ষীয় হবারই দরকার নেই। এই পীড়নের এই অবমাননার অভদ্রতায় দর্শকদেরও মহা আনন্দ। সে আনন্দের মূল শত্রুতায় নয়, কটুবাক্য সম্ভোগের এবং কারো অসম্মানের দৃশ্যটা দেখবার অহৈতুক পুলকে। আমাদের দেশ কবির লড়াইয়ের দেশ, তর্জ্জার দেশ, এদেশে নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায় মানুষকে অপমান করবার নৈপুণ্য কেবলমাত্র হতভাগ্য নিরপরাধ কন্যাকর্ত্তার ঘরে নয়, সাহিত্যের আসরেও জয়মাল্য সন্ধান করে। এই গ্রাম্যপ্রবৃত্তি আমাদের পলিটিকসকে কলুষিত করেচে এবং সকলপ্রকার লোকানুষ্ঠানের মর্য্যাদা এবং অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত শরশয্যাশায়ী

করতে উদ্যত। নিঃসহায় মোরগ ও মেড়ার লাঞ্ছনায় যে আনন্দোচ্ছ্বাস নিঃশেষিত হ'লে অপেক্ষাকৃত লঘুতর অপরাধ হোত আমাদের সেই তুয়ো দেবার দুর্দ্দাম নেশাকে আমরা সকল উপলক্ষ্যেই ভোগ করবার চেষ্টা করি ব'লে বাংলাদেশে কোন বড়ো কাজই ভদ্রভাবে বেড়ে ওঠবার সুযোগ পেল না; নিজের দেশের মানুষকে এবং কাজকে নিজের হাতে খর্ব্ব করবার সখ আমাদের কিছুতেই মিটতে চায় না। এই সখ বিছুটির মত গজিয়ে ওঠে, আমাদের রাষ্ট্রসভায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ে, সাময়িক পত্রে, জনসেবাকর্ম্মে, ছাত্রদের হস্‌টেলে। আমাদের সাহিত্য-বিচারে মননবস্তুর দৈন্য যথেষ্ট, সেই অভাবকে ঢেকে দিই তুয়ো দেবার উত্তেজক মসলায়। যাকে আমরা ভাল বলতে চাই তাকে ভাল ব'লেই আনন্দ পাইনে, তাকে পক্ষভুক্ত করে নিই, এবং আর একজনকে প্রতিপক্ষ খাড়া ক'রে তবে আমাদের সখ মেটে। একজন গুণীর পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার উপলক্ষ্যে আর একজনের প্রতিপত্তিকে ধূলিশায়ী করবার যে-উৎসাহ সে সাহিত্য নয়, সে সাহিত্যিক মোরগের লড়াই। এই লড়াইয়ে কোনদিন আমি যোগ দিইনি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েচি।"

সজনীকান্তের ধারণা যে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যিক মোরগে'র লড়াই লিখে 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সজনীকান্তের তখন বয়স কম, রক্ত গরম; আগের 'সজনে ফুল' ও 'মুরগী'র ঘা মনে ছিল, নতুন করে 'সাহিত্যিক মোরগে'র উপমা তাতে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই জ্বালার ফলে সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র জয়ন্তী-সংখ্যায় শালীনতার সীমা শোচনীয়ভাবে লঙ্ঘন করেছেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষে মহাসমারোহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে 'শনিবারের চিঠি' ছাড়া যাবতীয় সাময়িকপত্র বিশেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করেছে।

'শনিবারের চিঠি'র জয়ন্তী-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঘে। গোড়ায় মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি-বরণ' নামে একটি

প্রশস্তি-কবিতা ; সমাপ্তিতে সজনীকান্তের 'রবীন্দ্রনাথ' নামে আরেকটি প্রশস্তি-কবিতা। এই দুটি প্রশস্তি-কবিতা বাদে 'শনিবারের চিঠি'র জয়ন্তী সংখ্যায় আছে ব্যাজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ। শালীনতার সীমা শোচনীয়ভাবে লঙ্ঘন করে 'শনিবারের চিঠি'র জয়ন্তী-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র, কটু উপমা, শ্রদ্ধাহীন ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি। জয়ন্তী-সংখ্যার পর থেকে 'শনিবারের চিঠি'র কয়েক সংখ্যা ধরে রবীন্দ্রনাথের মুণ্ডপাত করে সজনীকান্ত হাতের সুখ করেছেন।

'শনিবারের চিঠি'র জয়ন্তী-সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার বহুকাল পর সজনীকান্ত লিখেছেন: "আমাদের আহত ভক্তি ও অভিমানটাই যে ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, এই সহজ কথাটা সাধারণ পাঠক তো বুঝিলই না, রবীন্দ্রনাথও বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ব্যবধান দুস্তরতর হইয়া উঠিল।"

মোহিতলাল মজুমদার, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৯ বৈশাখ, লিখেছেন: "যদিও সজনীর মতিগতি এবং লেখনী চালনার উপর আমার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, তথাপি সকলেই মনে করেন উহার পিছনে আমার প্ররোচনা আছে। কিন্তু এটা যে কত বড় ভুল, তাহা আমি বলিলেও কি কেহ বুঝিবে? আমার সঙ্গে 'চিঠি'র সম্পর্ক—মাসে মাসে কিছু লেখা পাঠানো, সজনী আর কোনও বিষয়ে আমার পরামর্শ লয় না, কিছু জানায় না ;···সজনী আমাকে ক্বচিৎ কখনও পত্র লিখিয়া থাকে, তাহাও পোস্টকার্ডে দুই চারি ছত্র, তাহা লেখা পাঠাবার তাগাদা। এ ছাড়া আমার সঙ্গে 'চিঠি'র সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। 'চিঠি'র পরিচালনা ও সম্পাদন প্রভৃতির ওপরে নজর রাখিবার কোনও সুযোগ আমি পাই না—সজনীও সে সম্বন্ধে অবহিত নয় ; অনেক বলিয়া, অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করিয়াও তাহার এই দায়িত্বহীন খাম-খেয়ালীর আমি কোনও প্রতিকার করিতে পারি নাই ; উপস্থিত এমন হইয়াছে যে আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার আদৌ নাই। 'চিঠি'র প্রকাশ সম্পাদন কার্য্যে এমন একটা haphazard অনিয়ম—অবহেলা

(১৭)

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN BENGAL

কল্যাণীয়েষু আমি পলাতকা। চলেছি পাহাড়ের দিকে। সুভাষ[illegible] অপ্রকাশ ভুল করেছি — উচিত [illegible] না যাত্রা যখন দুঃসহ ছিল তখন শীতের সকালে [illegible] বলে মন স্থির করতে [illegible] শহরের দুর্গতিগতি এসে পড়েছি। আবহাওয়াটা এখন ভালো হয়েছে প্রত্যেকবার এখন পাহাড়ে [illegible] কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে মন টলাতে গেলে [illegible] পায়ে সেটা [illegible] হয়ে তোলে দুর্গাপুর [illegible] তোমার [illegible] লাগল গোলাপ। কাল [illegible]

নমস্কার পর [illegible]।

কাব্যসাহিত্যে আমি ইতিহাসের [illegible] দিতে পারি নি,
আমার ও বুদ্ধি নেই। কবিতা যদি যেমন তেমন করে [redacted] [illegible]
তার দেশের [illegible] আমার হাতে হয় না। ও দিকে আমি [illegible]
করি নি। এর থেকে বুঝবে আমার স্বাধীনকাব্যের অবকাশ। কোনো
কোনো কবি লেখায় [illegible] এমনে যে আমি তাঁদের কবিতা [illegible]
করি অর্থাৎ তাঁদের মতের অনুসরণ করি। [redacted] কিন্তু তার প্রমাণ দেখাবার
নেই, থাকলেও হয়তো মনের [illegible] দুঃসাধ্য। কবি [illegible]
লেখার অনেক ছায়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হয় [illegible]। তাই
তোমার এতদিন [illegible] পরিশ্রম। তোমার আমি [illegible]-
সমস্ত রচনা, এই [illegible], তোমার [illegible]।

ফিরে আমি তোর [illegible] আলোচনা [illegible]
আলোচনা করব। ইতি [illegible] [illegible]

পাইয়াছে এবং সজনীর নিজের লেখা ও পরের লেখা নির্বাচন সম্বন্ধে এমন শৈথিল্য প্রকাশ পাইতেছে যে, আমি 'চিঠি'র সম্বন্ধে অতি নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি,—নিতান্ত মমতার বশে এখনও লেখা না পাঠাইয়া পারিতেছি না।…'চিঠি'তে আমি লিখি বলিয়া তাহার সকল লেখা যে আমার মনোনীত বা আমার জ্ঞাতসারে সন্নিবেশিত হয় তাহা যেন কেহ না মনে করেন। প্রতি মাসের 'চিঠি'র লেখাগুলির সম্বন্ধে বাহিরের পাঠকমণ্ডলী যেমন পূর্বাহ্নে কিছুই জানিতে পারেন না, আমার অবস্থাও তদ্রূপ।"

সজনীকান্ত, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে একদিন পরিমল গোস্বামীকে বলেছেন—আপনি 'শনিবারের চিঠি'র ভার নিন এবং কাগজটিকে বাঁচিয়ে রাখুন। 'শনিবারের চিঠি'র জন্য লেখা আপনাকেই যোগাড় করতে হবে। লেখার কোনও পারিশ্রমিক আমি দিতে পারব না। বিজ্ঞাপনও আপনাকে যোগাড় করতে হবে। 'শনিবারের চিঠি'র আয় যা হবে তা আপনি নেবেন। আপনার থাকবার জন্য একটি ঘর আমি আপনাকে দেব। আমার বাড়ির নিচের তলায় একটি ঘরে আপনি থাকবেন। আপনাকে কোনও ভাড়া দিতে হবে না।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষ থেকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি' পরিমল গোস্বামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

পরিমল গোস্বামী 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হওয়ার অল্পকাল পরের কথা।

বসু বিজ্ঞান মন্দির সম্পর্কে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সংবলিত একখানা ছোট চিঠি—'শনিবারের চিঠি'র একপৃষ্ঠার বেশি না—পেলেন পরিমল গোস্বামী। 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপাবেন বলে চিঠিখানা তিনি ছাপাখানায় দিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ স্যর জগদীশচন্দ্রের ভাগ্নে। ওই চিঠিখানার প্রুফ দেখার সময়ে ফণীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত। পরিমল গোস্বামী সেই প্রুফ দেখালেন ফণীন্দ্রনাথকে।

দেখে ফণীন্দ্রনাথ তখনই উঠে চলে গেলেন অবলা বসুর কাছে। অবলা বসু সব কথা শুনে ফণীন্দ্রনাথকে বললেন— এ সময়ে ও ধরনের কোনও সমালোচনাই ছাপা উচিত হবে না; হলে বিজ্ঞান মন্দিরের ক্ষতি হতে পারে। অতএব ওই চিঠি ছাপা বন্ধ হওয়া উচিত।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তখন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক। অবলা বসু ওই চিঠিখানা ছাপা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গোপালচন্দ্রকে পাঠালেন পরিমল গোস্বামীর কাছে।

পরিমল গোস্বামী সব কথা খুলে বললেন সজনীকান্তকে।

সজনীকান্ত প্রুফ নিয়ে চললেন অবলা বসুর কাছে, সঙ্গে চললেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

কয়েক ঘণ্টা পরে সজনীকান্ত ফিরে এসে পরিমল গোস্বামীকে বললেন—রফা হয়ে গেছে, অবলা বসুর কাছ থেকে কমপোজিংএর ক্ষতিপূরণ বাবদ কুড়ি টাকা নিয়ে এসেছি, ওই চিঠি ছাপা বন্ধ করে দিন।

সজনীকান্তের মৃত্যুর বহুদিন পর পরিমল গোস্বামী এই বিবরণ দাখিল করেছেন, হিসেব কষে দেখিয়েছেন যে তখন ষোল পৃষ্ঠার কমপোজিং ছাপা ও কাগজের দাম সহ এক হাজারের জন্য মোট খরচ পড়ত সাত টাকা বারো আনা, এবং মন্তব্য করেছেন: "এই হিসাবে এক পৃষ্ঠার ছোট একখানি চিঠি কমপোজ করা ও ভেঙে ফেলার জন্য সজনীকান্তের কুড়ি টাকা প্রাপ্তি লাভজনক বলতে হবে।"

আরেকটি ঘটনা। পরিমল গোস্বামী 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হওয়ার প্রায় আড়াই বছর পরের কথা।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা বিখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে এলেন। একথা-সেকথার পর তিনি সজনীকান্তকে বললেন—তোমার তো দেখছি মেসিন নেই. কাগজ চালাতে হলে শুধু টাইপেই কাজ হয় না, মেসিন একটা দরকার।

সজনীকান্ত ম্লান হাসলেন। বললেন—দরকার তো, কিন্তু পাই

কোথা ?

সত্যেন্দ্রনাথ তখন 'রূপবাণী' সিনেমার ঠিক পিছনের একটা মস্ত বাড়ির তেতলার ফ্ল্যাটে থাকতেন। পরদিন সকালে সজনীকান্তকে সেখানে যেতে বলে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

পরদিন সকালে সজনীকান্ত সেখানে গেলেন। সেখানে তখন উপস্থিত আছেন হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের হর্তাকর্তা নলিনীরঞ্জন সরকার। অনেক আজেবাজে কথার পর তিনি প্রস্তাব করলেন যে সজনীকান্তকে অবিলম্বে একটি ফ্ল্যাট মেসিন কেনার জন্য তিনি টাকা ধার দেবেন এবং সজনীকান্ত হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের বিজ্ঞাপন নিয়মিত লিখে ধার শোধ করবেন।

সেদিন দুপুরেই সজনীকান্ত হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের আপিসে গেলেন। মরজি ও ফুরসতমতো বিজ্ঞাপন লেখার জন্য সজনীকান্তের মাইনে দুশ টাকা—নিয়োগপত্রটি সজনীকান্তের হাতে দিয়ে নলিনীরঞ্জন প্রশ্ন করলেন—একটি ভাল পুরনো মেসিন কিনতে কত টাকা লাগতে পারে ?

সজনীকান্ত বললেন - একটা পুরনো ডবল-ক্রাউন রেকর্ড মেসিন মোটরসুদ্ধ বত্রিশ শ টাকায় পাওয়া যাবে। মোট সাড়ে চার হাজার টাকা হলেই চলবে।

নলিনীরঞ্জন একখানা তিন হাজার টাকার চেক লিখে সজনী-কান্তের হাতে দিলেন। বললেন--বাকি টাকা মেসিন ডেলিভারির পর দেব।

মেশিন কেনা হয়ে গেল। নলিনীরঞ্জনের কথামতো সজনীকান্ত একটি টেলিফোনও নিলেন।

টেলিফোনেই ডাক পেয়ে সজনীকান্তকে একদিন যেতে হল নলিনীরঞ্জনের গোপনকক্ষে। কেন সজনীকান্তকে টাকা ধার দিয়েছেন নলিনীরঞ্জন ? হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের বিজ্ঞাপন নিয়মিত লিখে সজনীকান্ত ধার শোধ করে দেবেন—এই কি আসল কথা ? না, তা

আসল কথা নয়।

সেসময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নলিনীরঞ্জন সম্পর্কে বিস্তর অপ্রিয় বাক্য প্রকাশিত হয়েছে। নলিনীরঞ্জনের গোপনকক্ষে সেদিনই সজনীকান্ত আসল কথা জানতে পারলেন—সজনীকান্তকে 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র বিরুদ্ধে লেখনীযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। উত্তরকালে সজনীকান্ত লিখেছেন: "সেইদিনই আমার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিন হাজার এবং বাকি দেড় হাজারও তখন লওয়া হইয়া গিয়াছে। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম, প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমি লিখিতে পারি, কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষসমর্থনে লেখনী ধারণ করিতে আমি অক্ষম। নলিনীরঞ্জনের হতাশাব্যঞ্জক প্রাদেশিক উক্তি এখনও আমার কানে বাজিতেছে—তাহা হইলে আপনাকে লইয়া আমি কি করিব? আমি কোনও আশাপ্রদ জবাব দিতে পারিলাম না। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্লকুমার সরকার, মাখনলাল সেনকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকি, তাঁহারাও আমাকে স্নেহ করেন। কুৎসার জবাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করিতেই হইবে। আমি তাহা পারিব না।"

নলিনীরঞ্জন বললেন—তাহলে আমার টাকাটার কী হবে?

সজনীকান্ত বললেন—তা তো মেসিন কিনতেই খরচ হয়ে গিয়েছে, অবিলম্বে ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

পরে সমস্ত ঋণ সজনীকান্ত শোধ করে দিয়েছেন।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষের 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত নিবেদন করেছেন: "অনেকে জানিতে চাহেন—সংবাদসাহিত্য আমি লিখিব কি না। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলি, সংবাদসাহিত্য যথারীতি আমি লিখিব…।"

পরবর্তীকালেও সজনীকান্ত মাসিক 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত 'সংবাদসাহিত্যে'র লেখক হিসেবে স্পষ্টাক্ষরে নিজের নাম ছাড়া আর কারও নাম উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই। কিন্তু নির্ভর-

যোগ্য সূত্রে জানি, একাধিক লেখক সজনীকান্তের রচনার ধারা ও চরিত্র বজায় রেখে 'সংবাদসাহিত্যে'র অংশবিশেষ রচনা করেছেন, অর্থাৎ, 'সংবাদসাহিত্যে'র অংশবিশেষ রচনায় তাঁরা সজনীকান্তের সহায়ক হয়েছেন। এমতাবস্থায় আমার বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত যে বাস্তবপক্ষে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত সকল 'সংবাদ-সাহিত্যে'র রচয়িতা স্বয়ং সজনীকান্ত।

এবার অনিবার্যভাবে 'বঙ্গশ্রী'র কথা এসে পড়ে।

'বঙ্গশ্রী' নামে একখানা মাসিকপত্র সজনীকান্তের সম্পাদনায়, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ পর্যন্ত, প্রকাশিত হয়েছে। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, 'শনিবারের চিঠি'র মতো সম্মানের উপহার অর্থাৎ কমপ্লিমেণ্টারি 'বঙ্গশ্রী'ও রবীন্দ্রনাথ ফেরত পাঠিয়েছেন।

মোহিতলাল মজুমদার, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৮ চৈত্র, লিখেছেন: "আমি লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি। জীবনে আর কোনও আশা, উৎসাহ বা রসপিপাসা নাই। পূর্বকর্মের জের টানিয়া চলিতেছি মাত্র। দেহ মন প্রাণ ভগ্ন হইয়াছে—নিজের উপরে আর কোনও আস্থা নাই। ···অর্ধপথেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছি। একমাত্র 'শনিবারের চিঠি' ও সজনীকান্ত আমাকে টানিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাহারই উৎসাহে ও নির্বন্ধাতিশয্যে আমি একটু আধটু লেখা এখনও ছাড়িতে পারি নাই।"

সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী'তে সম্পাদক হিসেবে চাকরি করেছেন বটে, কিন্তু তিনি 'শনিবারের চিঠি'র মালিক।

১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'বঙ্গশ্রী'তে রবীন্দ্রনাথের 'গদ্য ছন্দ' নামক একটি প্রবন্ধ ('কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত') প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৪ বৈশাখ, লিখেছেন: "সজনী-কে লেখা হয়েছিল ১০০ টাকার পরিবর্তে আমার একটা প্রবন্ধ যদি ইচ্ছা করে তবে পেতে পারে। ···সজনীর সঙ্গে যখন দেখা হল তখন

সে বললে কর্ত্তারা আশা করেছিলেন, দু তিন সংখ্যার মতো খোরাক তাঁরা পাবেন—অতএব অন্তত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার জন্যে আর একটা কিছু দিলে মনিব অর্থহানির জন্যে সান্ত্বনা পেতে পারেন। হায়রে রবীন্দ্রনাথ —বাজারে কোন্ দরে তোমার মূল্য যাচাই হচ্চে সেটা জেনে দর্পহারী মধুসূদনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে "আমার বঙ্গভূমি" থেকে এবার বিদায় গ্রহণ কর। এ নিয়ে তকরার করলে মর্য্যাদাহানি হয়, বললুম জ্যৈষ্ঠের জন্যে একটা কবিতা লিখে দেব। ঐখানেই শেষ।" কিন্তু সজনীকান্ত সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী'তে রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতা আমার চোখে পড়েনি।

১৩৪১ বঙ্গাব্দে রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে সজনীকান্ত 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' নামে একখানা বই প্রকাশ করেছেন, বইখানার লেখক সুকুমার সেন। এই বইখানার 'সংযোজনী' অংশে সুকুমার সেন লিখেছেন: "জ্ঞানচন্দ্রিকা পুস্তকটি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সৌজন্যে ব্যবহার করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য এখানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।" এবং বইখানার ভূমিকায় সুকুমার সেন লিখেছেন:

"বাঙ্গালা গদ্যভঙ্গি সম্বন্ধে দুই একটি বই থাকিলেও, এই বিষয়ে যথার্থ গবেষণা কিছুই হয় নাই। ১৩৪০ সালের বঙ্গশ্রী পত্রিকার জন্য আমি বিভিন্ন লেখকদিগের গদ্যভঙ্গির বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। সেই প্রবন্ধগুলি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান পুস্তকটি রচিত হইল।

"যে সকল বন্ধুদিগের প্ররোচনা এবং উৎসাহ বাঙ্গালা গদ্যের এই আলোচনায় আমাকে সানন্দে প্রবৃত্ত করাইয়াছে তাঁহাদিগের প্রতি আমি এইখানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

প্রশ্ন থেকে যায়—'যে সকল বন্ধুদিগের প্ররোচনা এবং উৎসাহ বাঙ্গালা গদ্যের এই আলোচনায়' সুকুমার সেনকে সানন্দে প্রবৃত্ত করিয়েছে এবং যাঁদের তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সজনীকান্ত কি তাঁদের অন্যতম?'

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১৬ আষাঢ় সজনীকান্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেব 'আজীবন সদস্য' হয়েছেন। দীর্ঘকাল সজনীকান্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন—১৩৪০-৪৩ বঙ্গাব্দে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ; ১৩৪৪-৪৬ বঙ্গাব্দে গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ; ১৩৪৬-৪৭ বঙ্গাব্দে পত্রিকাধ্যক্ষ ; ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে সাহিত্যশাখার সভাপতি ; ১৩৪৮-৫১ বঙ্গাব্দে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ; ১৩৫২-৫৫ বঙ্গাব্দে সম্পাদক ; ১৩৫৬-৫৮ বঙ্গাব্দে সহ-সভাপতি ; ১৩৫৮-৬২ বঙ্গাব্দে সভাপতি ; ১৩৬৩-৬৭ বঙ্গাব্দে সহ-সভাপতি ; ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে কোষাধ্যক্ষ। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যাচ্ছে—দীর্ঘকালব্যাপী পরিষদের প্রায় সমস্ত নতুন পরিকল্পনার মূল উৎস সজনীকান্ত, তাঁর পরামর্শ ছাড়া কোনও কাজ সম্ভব হয়নি সেখানে. পরিষদের সদস্যদের উপর তাঁর অসীম প্রভাব।

সজনীকান্তের মৃত্যুর দীর্ঘকাল বাদে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস-উৎসবের সভাপতি হিসেবে ডঃ সুকুমার সেন, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ, বলেছেন :

"দীর্ঘকাল সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সানন্দে যুক্ত থেকে একদা সেই যোগ বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছিল। সে কিছু দুঃখের কাহিনী।···

"এম-এ পাশ করে গবেষণায় রত আছি। আমার শিক্ষাগুরু সুনীতিবাবু একদিন আমাকে বললেন সাহিত্য পরিষদের সভ্য হতে আর পরিষদের মাসিক সভায় আমার গবেষণার বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতে। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে আমি অচিরে সাহিত্য পরিষদের সভ্য হলুম এবং লিখলুম।··

"বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের চর্চায় আমি গোড়া থেকেই সাহিত্য পরিষদের কাছে ঋণী। সাহিত পরিষদের পুথি অনেক রসদ যুগিয়েছে আমার লেখনীকে। সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ সর্বদা তৎপরতার সহিত আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তখন পরিষদের কর্ণধার ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়।···

"···আমার কাজের যেটুকু মূল্য আছে সে মূল্যের কিছু অংশ বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদের প্রাপ্য, এবং পরিষৎ আমার অন্যতম বিদ্যাধাত্রী।

"শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোধানের কিছুকাল পরেই মনে পড়ছে না সঙ্গে সঙ্গে কিনা পরিষদের কর্তৃত্ব এমন এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে চলে গেল যাঁরা আসলে 'জার্নালিষ্ট', অবসর সময়ে গবেষক। তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্র উনবিংশ শতাব্দী সুতরাং তাঁদের নির্ভর ছিল ছাপা বই কাগজের উপর। উনবিংশ শতাব্দীর বাইরে গেলে পুথি নিয়ে ঘাঁটা-ঘাটি করতে হত। সেদিকে তাঁদের প্রবৃত্তি ছিল না বরং নিবৃত্তিই ছিল। তাঁরা কর্তা হয়ে গদিতে বসে পুরানো পুথি প্রকাশের সম্ভাবনা পর্যন্ত লোপ করে দিলেন, পরিষৎ প্রকাশিত সমস্ত পুরানো গ্রন্থের ষ্টক ওজনদরে বাজে কাগজের মত বেচে দিয়ে। এতে পরিষদের যে ক্ষতি হয়েছে তা অনুমান করা দুরূহ নয়। পরীক্ষায় পাঠ্য আছে অতএব অর্থাগম কিছু হয় বলে দুখানা বই এঁরা দয়া করে ছাপতে লাগলেন। —বৌদ্ধ গান ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। তাঁরা সাহিত্য পরিষদকে ছাপা বইয়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশ ভবনে পরিণত করলেন। আর কেউ যে ছাপা বই নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের আলোচনা করে তা তাঁদের মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। এখন তাঁরা যখন ক্ষমতায় এলেন তখন আমি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য আলোচনায় রত। একদিন এমন একখানি বই দেখার দরকার ঘটল যে বই অন্যত্র কোথাও নেই। পরিষদ মন্দিরে এসে বইটি দেখতে চাইলুম। আমাকে বলা হল, বার করে রাখব কাল আসবেন। পরেব দিন গেলুম। কর্মচারী মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, অমুকবাবু বলেছেন ও বই কাউকে দেখতে দেওয়া হবে না। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলুম, অমুকবাবুকে বলবেন সাহিত্য পরিষৎ বাঙালী শিক্ষিত সাধারণেব অধিকারভুক্ত সম্পত্তি, অমুকবাবুর পৈতৃক অথবা স্বোপার্জিত জমিদারি নয়, আমি কাল এই সময়ে আসব, বই আমাকে দেখান চাই-ই। বলা বাহুল্য পরের দিন বইটি আমাকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল।

"ক্রোধ প্রশমিত হবার পর দুঃখ জাগল। এমন করে লাঠালাঠি

করা কি ভালো! সাহিত্য পরিষৎ মণি বিভূষিত হলেও আমার কাছে কালসর্প অধ্যুষিত সুতরাং ভয়ঙ্কর বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। পরের দিনই আমি পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে চিঠি দিলাম।…"

প্রশ্ন থেকে যায়—ডঃ সুকুমার সেন কথিত 'অমুকবাবু' ও 'কালসর্প' কি সজনীকান্ত?

কথায়-কথায় বড় বেশি দূরে এসে পড়া গেল। এবার আরও অনেক আগের কথায় ফিরে যাওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৪ ভাদ্র, লিখেছেন: "হঠাৎ খবর পেলুম আমাদেরি…কোনো লোক সজনীকান্তকে নিন্দা করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে। কিছুদিন আগে সজনীকান্ত রজতজুবিলির অভিনন্দনসূচক পত্রে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে আমার কাছ থেকে লেখা চাইবার জন্যে আশ্রমে এসেছিলেন। আমি দিতে পারি নি, তাঁকে উপেক্ষা করা তার কারণ নয়। এই অনুরোধ নিয়ে তাঁর ভাষায় বা ব্যবহারে আত্মলাঘবজনক কিছুই প্রকাশ পায় নি। লেখার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ জানান নি বাংলাদেশে এমন সম্পাদক অল্পই আছে, তার দ্বারা তাঁরা আমাকে সম্মান করেচেন কিন্তু আত্মসম্মানের হানি করেচেন এমন কথা বলা অসঙ্গত। যা হোক আমাকে জড়িত করে এই রকম অন্যায় কুৎসাবাদের সৃষ্টি করায় আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ ও দুঃখ বোধ করেচি।"

আবার 'বঙ্গশ্রী'র গোড়ার দিকের কথায় ফিরে যাই।

'বঙ্গশ্রী'র প্রথম সংখ্যায় (মাঘ, ১৩৩৯) 'শ্মশান-ঘাট' নামে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তারাশঙ্কর তখন বঙ্গসাহিত্যে প্রায়-নবাগত।

তারাশঙ্করের গ্রামের বাড়ি থেকে পনের মাইল দূরে দৈধা বৈরাগী-তলায় বৈষ্ণবসাধক গোপালদাস বাবাজীর আবির্ভাব তিথিতে বিরাট মেলা বসে। মাঘমাসের দুরন্ত শীতের মধ্যে দৈধার মেলার গাছতলায় বসে তারাশঙ্কর 'মেলা' নামে একটি গল্প রচনা করেছেন। ছাপা হওয়ার

আগে এই গল্পটি পড়ে তারাশঙ্কর সম্পর্কে সজনীকান্ত বলেছেন—এই লোকটি বাঙলা সাহিত্যে অনেক কথা - এ-যুগের লেখকদের সকলের চেয়ে বেশি কথা—বলতে এসেছে। এঁর পুঁজি অনেক। এনেছে অনেক।

'মেলা' সজনীকান্ত ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'বঙ্গশ্রী'তে ছেপেছেন বটে, কিন্তু একটি প্যারা বাদ দিয়েছেন। উত্তরকালে তারাশঙ্কর লিখেছেন: " 'মেলা' গল্পের শেষ একটি প্যারা সজনীকান্ত বাদ দিলেন। প্রথমটা মন খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু ছাপা হওয়ার পর পড়ে সজনীকান্তের শিল্পবোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।"

'বঙ্গশ্রী'র আসরে সজনীকান্তের সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিচয়।

পুলিশের কুনজরে পড়ে তারাশঙ্করকে আলাদা বাসা করে স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকতে হল। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের প্রথমার্ধের কথা। ঘরভাড়া পাঁচটাকা। লাইট-চার্জ একটাকা। চা-জলখাবার সাত-আটটাকা। খাবার খরচ আটটাকা—এবেলা দু-আনা, ওবেলা দু-আনা। ট্রামবাস অন্য খরচ আটটাকা। মাসে তিরিশ টাকা। খবর পাওয়া গেল, পুলিশের একজন বড়কর্তা তদন্ত করছেন—কোন আয়ে তারাশঙ্কর কলকাতায় থাকেন, কী তাঁর জীবিকা? উত্তরকালে তারাশঙ্কর লিখেছেন: "শঙ্কিত হলাম। গল্প লিখে মাসে ত্রিশ টাকা উপার্জন করি—এ প্রমাণ করা সহজ ব্যাপার নয় বলেই মনে হল। অনেক ভেবে অবশেষে ছুটে গেলাম সজনীকান্তের কাছে। পরিমল গোস্বামী 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক। ওর নীচে সহ-সম্পাদক হিসেবে আমার নামটা দিতে হবে। এবং 'শনিবারের চিঠি'র মাইনের খাতায় আমার নাম তুলে তিরিশ টাকা হিসেবে খরচ লিখতে হবে। মাইনে অবশ্য আমি নেব না; এবং কুড়ি টাকার অধিক হলে খরচ দেখানোর বিশুদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী যে এক আনার টিকিট লাগে সেটাও আমি দেব। সজনীকান্ত হেসে বললেন, তাই হবে।"

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে পৌষ পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'তে সহ-সম্পাদক হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছাপা আছে।

ইতিপূর্বে তারাশঙ্কর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' নিজের খরচে প্রকাশ করেছেন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে ; বই দেড়বছরে পঞ্চাশ-ষাট খানার বেশি বিক্রি হয়নি—একখানা তারাশঙ্কর নিজেই খরিদ্দার সেজে কিনেছেন।

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১০ অগ্রহায়ণ। 'বঙ্গশ্রী' আপিসের সিঁড়ির পর দরদালানের মত অংশটির কাঠের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছেন তারাশঙ্কর, 'চৈতালী ঘূর্ণি'র দপ্তরী হঠাৎ এসে হাজির। বলল—আমি 'চৈতালী ঘূর্ণি'র ফর্মা আর রাখতে পারব না। একশ বই বেঁধে দিয়েছি দেড়-বছর দু-বছর আগে। তার কিছু টাকা আমি পাব। আব বাকি ফর্মাগুলি মলাট না দিয়ে বেঁধে রেখেছি, তার টাকা পাব। আপনি আমার টাকা মিটিয়ে বইগুলো নিয়ে নিন। গুদামে আমার জায়গা নেই। এ বই আমি রাখব না। না নিলে পুরনো কাগজের দরে বেচে দেব ফুটপাথের হকারদের।

তারাশঙ্কর মনে-মনে বললেন—মা ধরণী, দ্বিধা হও, আমি তোমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে এ লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাই। মন্দকবিযশ-প্রার্থীর সমাধি হয়ে যাক্!

দপ্তরী বলল -বাবু! কি বলছেন বলুন?

তারাশঙ্করের সম্বল তখন গোটা আট-দশটাকা। তাঁর চোখের সামনে পৃথিবীটা কালো হয়ে গেল। কোনও উত্তর খুঁজে পেলেন না।

হঠাৎ শুনতে পেলেন ভারী পায়ের জুতোর শব্দ। আরও লজ্জায় মাথা নুয়ে গেল। তারাশঙ্কর নির্ভুল অনুমান করেছেন—সজনী-কান্তের পায়ের শব্দ।

কাছে এসে সজনীকান্ত থমকে দাঁড়ালেন। রূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে? কি?

তারাশঙ্কর চুপ। সব কথা বলে দপ্তরী সজনীকান্তকেই সালিস

মানল—আপনিই বলুন বাবু, এই বই রেখে কি করব আমি? দেড়-বছরে—

কথা শেষ করতে দিলেন না সজনীকান্ত। ওই রূঢ় গলায় প্রশ্ন করলেন—কত? কত টাকা পাবে তুমি?

দপ্তরী বলল—বোধ করি ছাপান্ন টাকা কয়েক আনা।

সঙ্গে সঙ্গে সজনীকান্ত বুকপকেট থেকে ব্যাগ বের করে দপ্তরীর হাতে ছখানা দশটাকার নোট দিয়ে বললেন—এই নাও তোমার টাকা। বই সমস্ত আমার 'শনিবারের চিঠি'র ঠিকানায় তুলে দাও। বাকিটা মুটে ভাড়া রইল। বেশি লাগলে দেব।

তারপর তারাশঙ্করকে বললেন—আপনি সঙ্কুচিত হবেন না তারা-শঙ্করবাবু—আজ থেকে আমি আপনার পাবলিশার হলাম। বইয়ের ভার আমার রইল।

সজনীকান্ত আর দাঁড়ালেন না, ভারী পায়ে শব্দ তুলে কাঠের সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন।

তারাশঙ্কর অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর চোখে জল এল। বিস্ময়েরও অবধি রইল না। বিস্ময়ের কারণ—যে-সজনীকান্তকে ভেবেছেন পাথর, তাঁর মধ্যে কোথায় ছিল এই উদারতার নির্ঝর! উত্তরকালে তারাশঙ্কর লিখেছেন: "উদারতাই বলব। প্রীতি বলব না। সেদিন তিনি আমার প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতিবশে এই কাজ করেন নি। ব্যক্তিগত হিসাবে হয়তো অনুগ্রহবশতই করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মর্যাদা রাখবার জন্য এর মধ্যে একটি সুনি-শ্চিত সসম্ভ্রম উদারতা ছিল, এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি। একা আমি নই; আমাদের সময়ের আরও অনেকে এইভাবে তাঁর উদারতায় উপকৃত হয়েছেন। তার দলিল দেখেছি আমি ··।"

সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী'র চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার কিছুকাল পরের কথা। তারাশঙ্কর তখন থাকেন বালিগঞ্জে মহানির্বাণ রোডের কাছে একখানা পাঁচটাকা ভাড়ার ঘরে, পাইস হোটেলে খান, দুপুরে চলে

আসেন 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে—নিজের লেখা পড়ে শোনান, বিশ্রাম করেন। তারপর একসময়—তারাশঙ্করের শরীর তখন ভেঙেছে, পাইস হোটেলে খাওয়া সহ্য হচ্ছে না। উত্তরকালে তারাশঙ্কর লিখেছেন : "সজনীকান্ত আমাকে আমন্ত্রণ করলেন শনিবারের চিঠির আলয়ে, দু মাসেরও অধিককাল শনিবারের চিঠির পরিচর্যায় পরম তৃপ্তি অনুভব করেছি। জীবনে 'অন্নঋণের' মত নিষ্ঠুর ঋণ আর হয় না, এ যেন সারা জীবনে পরিপাক পায় না, মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে পীড়িত করে রাখে ; ···কিন্তু শনিবারের চিঠির এই পরিচর্যা, এই অন্ন কখন যে পরিপাক পেয়ে গেছে তা বলতে পারব না। কোনদিন কোন পীড়া অনুভব করিনি। শনিবারের চিঠি এবং সজনীকান্ত বরং এই সত্যই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা ধন্য হয়েছেন একজন সাহিত্য-সাধকের সেবা করে।"

ক্রমশ দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

'রসকলি' নামে তারাশঙ্করের একখানা গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। তারাশঙ্করের দাবিতে সজনীকান্ত 'রসকলি'র ভূমিকা লিখেছেন ; 'ভূমিকা' থেকে প্রথম বাক্যটি উদ্ধৃত করি : "নিছক বন্ধু-প্রীতির দাবিতে আমাকে দিয়া তারাশঙ্কর যাহা করাইয়া লইতেছেন, অদূর ভবিষ্যতে তাহা আমার স্পর্দ্ধা বলিয়া বিবেচিত হইবে, এই বিশ্বাস আমার আছে বলিয়াই আনন্দের সঙ্গে লিখিতে বসিয়াছি।"

সজনীকান্ত হঠাৎ একদিন তারাশঙ্করকে 'বড়বাবু' বলে ডাকলেন।

তারাশঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন—কেন ? এ নাম কেন ? রসিকতা ?

সজনীকান্ত বললেন—না। তুমি বড় হয়ে গেছ বলে।

তারাশঙ্কর হেসে বললেন—তাহলে তুমি ছোটবাবু।

সজনীকান্ত বললেন—খুব ভাল।

তারাশঙ্করের মতে সজনীকান্ত একজন সত্যিকার সাহিত্যরসিক, একজন উদার মানুষ, বহু গুণের মানুষ। তারাশঙ্কর সজনীকান্তের খুব কাছের মানুষ হয়েছেন। তারাশঙ্কর লিখেছেন : "সজনীকান্তের

এত কাছে এলাম যে, তাঁর ভালমন্দ সবকিছু আমি দেখলাম—দেখতে পেলাম। দোষ তাঁর ছিল। নির্দোষ মানুষ সংসারে কজন? কিন্তু গুণ, আমি দেখেছি, যাচাই করেছি, সে অনেক এবং তা সুদুর্লভ। এত গুণের মানুষ—বর্তমানকালে বেশী নেই। তবে সাহিত্য-বিচারক, সাহিত্য-প্রেমিক হিসাবে তাঁর দোসর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ।"

তারাশঙ্কর সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে এ-যুগে সজনীকান্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরসাধকের সম্মান দিয়েছেন। তারাশঙ্কর স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন: "সজনীকান্ত সাধকের চেয়েও শক্তিশালী উত্তরসাধক। তন্ত্রমতে সাধক যখন শ্মশানে শবসাধনায় বা এমনি কোনো পদ্ধতির সাধনায় আসন গ্রহণ করেন তখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় একজন উত্তরসাধকের। উত্তর-সাধক বিনিদ্র চোখে সাধনস্থানের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকেন সদাজাগ্রত নন্দীকেশ্বরের মতো। এবং অহরহ উচ্চারণ করেন মা-ভৈ বাণী। সেই মা-ভৈ বাণী ভয়ঙ্কর শ্মশানেও সৃষ্টি করে এক অভয় পরিমণ্ডলের। সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রশান্ত অনুদ্বিগ্ন সাধক সাধনা করে যান। সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে এইযুগে সজনীকান্তের মতো এত বড় উত্তরসাধক আমি আর দেখিনি।"

সাহিত্যিক দিকপালদের মধ্যে যিনি সজনীকান্তের কাছে এসেছেন তিনিই এই উত্তরসাধকের বলে বলীয়ান হয়েছেন—তারাশঙ্করের বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কেউ-কেউ একথা অকপটে স্বীকার করবেন।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'বঙ্গশ্রী'তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। 'সরীসৃপে'র আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও গল্প 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হয়নি। সজনীকান্ত 'সরীসৃপ' গল্পেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোক্ত-পরিণত মনের পরিচয় পেয়েছেন—মন সরল সাধারণ নয়, কুটিল জটিল অসাধারণ।

১৩৪১ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত 'সাল-

তামামী'তে কয়েকজন শক্তিশালী লেখকের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত মন্তব্যটুকু উদ্ধৃত করি : "আর একজন অতিশয় তরুণ লেখকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করিলে অতিশয় অন্যায় করা হইবে। ইনি শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার রচনা সম্বন্ধে এখনও কিছু বলিবার সময় আসে নাই···আশা করি যখন সে সময় আসিবে তখন দেখা যাইবে যে দৃষ্টিভঙ্গি কল্পনা ও প্রকাশরীতির মৌলিকতায় তিনি বাংলা গল্প-সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র আসন পাইবার উপযুক্ত, হয়ত যে আধুনিকতার জন্য আমরা এত উদ্গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাঁহার রচনায় সেই আধুনিকতা সত্যকার প্রতিভাযুক্ত হইয়া অতি-আধুনিক ও শাশ্বত-সনাতনকে বিরোধমুক্ত করিবে। এই বালকের রচনায় রসকল্পনার সহিত যে আশ্চর্য্য মনস্বিতার সমাবেশ লক্ষ্য করিতেছি তাহা সত্যই বিস্ময়কর। তথাপি, তাঁহার রচনায় এখনও নিটোল কল্পনা বা খাঁটি সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই—এখনও পূর্ণ রসসৃষ্টির অভাব আছে। আশা করি বয়সের সঙ্গে দৃষ্টির সেই পূর্ণতা লাভ ঘটিবে—অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে তিনি কলঙ্ক-মুক্ত করিবেন।"

'জননী' নামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন। 'জননী'র আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

'জননী' প্রকাশিত হওয়ার অল্পকাল আগে একটি মাসিকপত্রের সহকারী সম্পাদক পদপ্রার্থী হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একখানা আবেদনপত্র রচনা করেছেন। আবেদনপত্রখানা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি : "আমার প্রকৃত নাম শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আমি সাহিত্যসেবা করিয়া থাকি। আমার বর্ত্তমান বয়স ছাব্বিশ বৎসর। ঈশ্বরেচ্ছায় ইতিমধ্যে আমি লেখক হিসাবে কিছু সুনাম অর্জ্জন করিয়াছি। আমার সম্বন্ধে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত মন্তব্য এই সঙ্গে পাঠাইলাম।"

এই আবেদনপত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত ১৩৪১ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন।

সম্ভবত ১৩৪২ বঙ্গাব্দের কয়েকদিনের কথা। ২৫/২ মোহনবাগান রো-তে সজনীকান্ত দোতলায় কয়েকদিন অপরিবার থেকেছেন। দোতলার একটি ঘরে আড্ডা জমেছে কয়েকদিন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন আড্ডায়। রাত এগারোটার আগে আড্ডা থামেনি। বাজি ধরে তাস খেলা চলেছে কদিন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজি ধরার ধরন বেপরোয়া—সতর্কতার কোনও বালাই নেই। এ-বিষয়ে তিনি সমধর্মী সজনীকান্তকে পর্যন্ত চমকে দিয়েছেন। এবং আরেকটি খবর —যাবার সময়ে প্রতিদিনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধারে ফেরার বাস-ভাড়া দিয়ে দিতে হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেছেন ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৮ বৈশাখ। সজনীকান্ত লিখেছেন: "বরাহনগরে আমরা সাহিত্যিকেরাই এই বিবাহে মোড়লি করিয়াছিলাম।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১৭ অগ্রহায়ণ। সজনীকান্ত লিখেছেন: "মানিক স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য-বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার পরিবারকেও এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে কি না মানিকের জীবিত দাদারা তাহা নির্ধারণ করিবেন। না করিলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধব-দেশবাসীর দায়িত্ব গুরুতর। আমরা প্রস্তাব করি, আপাততঃ এই বৎসরে তাঁহাকে রবীন্দ্র-পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করুন। এখন পর্যন্ত যাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন মানিক তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা যোগ্যতায় ন্যূন নহেন। ···এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততঃপক্ষে পাঁচখানি উপন্যাস ও গল্পপুস্তক রচনা করিয়াছেন, যাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সাদরে স্বীকৃত হইবে এবং বাংলাদেশের সাহিত্যকে অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

(১৪)

ওঁ

HOUSEBOAT
"PADMA"

কল্যাণীয়েষু

[illegible]

তোমাদের [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]।
মাতৃ[illegible] [illegible] এই
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
না। [illegible] [illegible]। আমি
[illegible], [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible]

তার আমারই উপায়ে। আমার
দেখি এর সমস্যা প্রচুর প্রতিদিন
হবে কারণ। একটি দল [illegible]
[illegible] সর্ব-
[illegible]। [illegible]
[illegible] হবে। এই দিনে
[illegible]। এই সম্ভ-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] হয়।
[illegible]
কেবল আমি দায়ী। [illegible]
এরই হয় আমি [illegible]
তার [illegible] আছি। ইতি [illegible]
[illegible]

কিন্তু রবীন্দ্র-পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেনি। অতঃপর সজনীকান্ত লিখেছেন: "বহু সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মানিকের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল, অনেক সংবাদ-ও-সাময়িক-পত্রও এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-পুরস্কার-সমিতি এই দাবি ও সুপারিশ উপেক্ষা করিয়াছেন। সাহিত্যিক মূল্যবিচারের দিক হইতে ইহা করা হইয়া থাকিলে নিঃসংশয়ে বলিব, এই সমিতি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের বিচারের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং অবিলম্বে এই জরদ্গব-সমিতি ভাঙিয়া দেওয়া কর্তব্য। তবে যদি রাজনৈতিক কারণে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এইরূপ করা হইয়া থাকে, আমাদের কিছুই বলিবার নাই। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ডস্টয়ভ্স্কির সাহিত্য যদি তাঁহার স্বদেশ, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াও বর্জন করিতে পারে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-ও-চিকিৎসকবৃন্দ যদি কমরেড ভিসারিওনোভিচ স্টালিনকে সম্বোধন করিয়া দ্বিধালজ্জাহীন অকুণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারেন (৪ঠা জুলাই ১৯৫০):

'We, at this session of the Academy of Sciences of the U.S.S.R. and the Academy of Medical Sciences of the U.S.S.R....desire to convey to you our ardent greetings, as a pre-eminent Scientist.'

তাহা হইলে মানিকেরও রবীন্দ্র-পুরস্কারের অনুপযুক্ত হইতে বাধা নাই। মানিক মৃত বলিয়া তাঁহাকে বাতিল করিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কারণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশের নজির রহিয়াছে। নির্দিষ্ট বর্ষকাল মধ্যে রচিত গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত অপকর্ষও যে পুরস্কারের বাধা হয় না তাহার প্রমাণ রাজশেখর বসু মহাশয়। 'গড্ডলিকা'—'কজ্জলী'র সুদৃশ্য ও সুস্বাদু নৈবেদ্যের চূড়ায় 'কৃষ্ণকলি'র বাতাসা যখন মর্যাদা পাইয়াছে তখন 'দিবারাত্রির কাব্য' —'পুতুলনাচের ইতিকথা'—'পদ্মা নদীর মাঝি'র সম্ভার-শীর্ষে 'মাশুলে'র

মর্যাদা তেমন নিন্দনীয় হইত না।" ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র, ১৩৬৩, পৃ. ৫৮৩)

আবার 'বঙ্গশ্রী'র কথায় ফিরে যাই। সজনীকান্ত সম্পাদিত "বঙ্গশ্রী'র আসরে বহু জ্ঞানীগুণী এসেছেন। উত্তরকালে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন :

"সজনী-কেন্দ্রিক 'বঙ্গশ্রী'কে ঘিরে কি বিচিত্র ভিড়, কি বিচিত্র সম্ভাবনা।

"সজনীকান্তের চরিত্র ছিল রহস্যময়। তিনি কখনো তাঁর শেষ দেখতে দিতেন না। প্রতি পদে বিস্মিত হয়েছি। অনেক সময় ইচ্ছে ক'রে রহস্য বাড়াতেন। অনেক জটিল সমস্যার কি ক'রে যে সহজ সমাধান খুঁজে পেতেন তা আজও জানি না।···

"ভীরুতা দেখিনি কখনো।

"অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা দেখিনি কখনো, তা সে নিজের জন্যই হোক বা আশ্রিতের জন্যই হোক।"

'বঙ্গশ্রী'র কর্তার নাম সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। তিনি একদিন সজনী-কান্তের অজ্ঞাতসারে 'বঙ্গশ্রী'র জন্য একটি গল্প নির্বাচন করেছেন এবং ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। সচ্চিদানন্দের এই অনধিকার চর্চার খবর পেয়ে সজনীকান্ত তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন, টেলিফোনে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে কিছু তর্ক ও কথা কাটাকাটি করেছেন এবং সেদিনই —১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১ মাঘ—'বঙ্গশ্রী'র চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন।

সজনীকান্তের পক্ষ হয়ে তারাশঙ্কর গায়ে পড়ে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন। তখন 'জমিদারের মেয়ে' নামক তারাশঙ্করের একখানা উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ 'বঙ্গশ্রী'তে আরম্ভ হয়েছে। তারাশঙ্করের সঙ্গে সজনীকান্তের তখন পর্যন্ত, মনে রাখা দরকার, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তবু তারাশঙ্কর 'জমিদারের মেয়ে' বন্ধ করে দিয়েছেন 'বঙ্গশ্রী'তে এবং সেই উপন্যাসই 'ধাত্রী দেবতা' নামে 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এবং সজনীকান্তের পক্ষ হয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও গায়ে পড়ে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন। বিভূতিভূষণের সঙ্গে সজনীকান্তের সম্পর্ক তখন, বলা বাহুল্য, বিবিধ বন্ধনে খুব ঘনিষ্ঠ।

বিভূতিভূষণ মারা গেছেন ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১৫ কার্তিক। উত্তরকালে সজনীকান্ত লিখেছেন: "বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে সহস্র কথা আমার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া আছে। যথাসময়ে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব। এইখানে শুধু একটি কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া রাখি যাহা আমরা অর্থাৎ তাঁহার সমসাময়িকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি যেন মানসসরোবর হইতে শীতঋতু যাপনের জন্য আমাদের এই পঙ্ককর্দম ও শৈবাল-লাঞ্ছিত পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এখানকার ঝাঁকে মিশিতে পারেন নাই। আমরা শুধু দেখিলাম, বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নব শুচিতা ও সহৃদয়তার আমদানি করিলেন। আমরা দীর্ঘ বিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যে সহজ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই, বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যের সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।"

'বঙ্গশ্রী'র চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার পর সজনীকান্ত অল্পকাল নিখিলচন্দ্র দাসের সঙ্গে এবং তারপর অল্পকাল কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা করেছেন। সজনীকান্তের সঙ্গে কপিলপ্রসাদের পার্টনারশিপ ভেঙে যাওয়ার সূত্রে একটি তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মকদ্দমা পর্যন্ত গড়িয়েছে কিন্তু কিছু প্রমাণ হয়নি। সজনীকান্তের মৃত্যুর বহুদিন পর পরিমল গোস্বামী লিখেছেন: "সজনীকান্ত গোড়াতেই নিখিলবাবু অথবা কপিলপ্রসাদের সঙ্গে পার্টনারশিপে এসেই তা ভেঙে দেওয়াতে তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ যৌথ কারবার বাঙালীর মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না। প্রথমে মনে হয় ঠিক হবে, শেষে অনুতাপ করতে হয়। তাই ও ব্যাপারটা গোড়াতেই চুকিয়ে দেওয়া ভাল। আত্মহত্যায়

যাদের প্রবণতা বেশি তারা প্রথম বয়সেই যে-:কোনো তুচ্ছ উপলক্ষে, পরীক্ষায় ফেল করে অথবা প্রণয়ে ফেল করেই আত্মহত্যা করে। এ প্রথা ভাল। কারণ পরে সংসারে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রী সন্তানাদিকে পথে বসিয়ে আত্মহত্যা করলে পাপ আরো বাড়ে। এ জন্য মনে হয় নিখিল-চন্দ্র দাস এবং কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য—দুজনেরই সজনীকান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ পার্টনারশিপটি দুটি ক্ষেত্রেই অল্প বয়সে আত্মহত্যা করেছিল।"

আরেকরকম একটি তথ্য এখানে উল্লিখিত হয়ে থাকা ভাল— 'রাজহংস' নামে সজনীকান্তের একখানা কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৬ বৈশাখ, প্রমথনাথ বিশীকে লিখেছেন: "রাজহংস বইখানি ভালো হয়েছে। আমার মতে কবিতার দুই জাত আছে ভালো এবং মন্দ। মাঝখানে যে সঙ্কর বর্ণের আবির্ভাব দেখা যায় তাদের জাতি নির্ণয় করতে বৃথা পরিশ্রম না করাই শ্রেয়। এই ইসারা-টুকু দিয়েই ক্ষান্ত হলুম…।"

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক আবার সজনীকান্ত। তারপর সজনীকান্ত আজীবন 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকত্ব করেছেন।

সাহিত্য-সমালোচনার মূলসূত্র ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'তে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। মোহিতলালের এই কার্যের সঙ্গে সজনীকান্তের সাহিত্য-প্রীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মোহিতলাল, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে, লিখেছেন: "যাঁহাদের অকৃত্রিম আগ্রহ ও সাহিত্যিক সমপ্রাণতা এই কার্য্যে আমার উৎসাহ রক্ষা করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান সজনীকান্ত দাস, শ্রীমান নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের নাম আমি এখানে স্মরণ করিতেছি। শ্রীমান সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে অতিশয় অপ্রিয় ও দুঃখকর আলোচনার ভার লইয়া যে

ভাবে আমার লেখাগুলির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতেন—নিন্দার বিষ নিজ অংশে রাখিয়া যে ভাবে প্রশংসার মধু আমার জন্য সংগ্রহ করিতেন, এবং তাহাতেই কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন—আজিকার দিনে সেরূপ সাহিত্য-প্রীতি যথার্থই দুর্ল্লভ।"

'স্মরগরল' নামে মোহিতলাল মজুমদারের একখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে। মোহিতলাল, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৪ চৈত্র. লিখেছেন: "সজনীবাবুর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির বলে 'স্মরগরল' প্রকাশিত হইয়াছে—সে কীর্তির যশ বা অযশ তাঁহারই প্রাপ্য।"

পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১২-১৪ পৌষ। এই সম্মেলনে সাহিত্য বিভাগের সভাপতির অভিভাষণে মোহিতলাল বলেছেন: "সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলীর—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার—একটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছেন; তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী রচনা ও চিঠিপত্রও বাদ যাইবে না। গ্রন্থকারের জীবিতকালের গ্রন্থগুলির যত সংস্করণ হইয়াছিল সেই সকলগুলি মিলাইয়া অতিশয় যত্ন সহকারে এই সংস্করণের পাঠ নিরূপিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের এই জাতীয় সম্পদ এভাবে সম্পাদিত হয় নাই; এবং বঙ্কিমচন্দ্রকেই যে এত কাল পরে এমন ভাবে উদ্ধার করা হইতেছে, এ সংবাদে আপনারা সকলেই উল্লসিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমার পক্ষ হইতে ইহাও জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এই গুরু দায়িত্ব ও পরিশ্রমের ভার যে দুই শ্রদ্ধাবান ও শক্তিমান সাহিত্যিকের উপর দেওয়া হইয়াছে, তাহাও আশার কথা; তজ্জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান সজনীকান্ত দাস যে সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হইবেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহারা যে পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, তাহাই আমাকে ঈর্ষান্বিত করিয়াছে।"

আবার রবীন্দ্রনাথের কথায় ফিরে যেতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ও

সজনীকান্ত সম্পর্কে কিছু খুঁটিনাটি খবর বাদ পড়ে গেছে। যাক। অতঃপর একটানে পুনর্মিলনের কথায় চলে আসি।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়' নামে একটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৩০ জ্যৈষ্ঠ। 'বাংলা কাব্যপরিচয়' প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী প্রকাশন সংস্থার কিশোরীমোহন সাঁতরা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১৪ আষাঢ়, রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :- "যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য আশা করেছিলাম সেই সব লোকের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাইনি। অথচ যাদের কাছে আমি একটুও সাহায্য আশা করিনি বা পাবার জন্য চেষ্টাও করিনি এমন সব লোক নিজ হতে এসে সাহায্য করেছেন। যেমন সজনীকান্ত দাস নিজ হতে এসে অনেক কবিদের ঠিকানা জোগাড় করে দিয়েছে। তাঁর কাছ থেকে ঠিকানা না পেলে এত তাড়াতাড়ি সবাই-এর কাছে চিঠি পাঠানো সম্ভব ছিল না। আমাদের কোনো কাজে বা সাহায্যে আসতে পারেন কিনা এ বিষয়েও বারবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।"

হঠাৎ, জোড়াসাঁকো ভবন থেকে, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ সকাল বেলা সজনীকান্তের কাছে ডাক এল—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সজনীকান্ত জোড়াসাঁকোয় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে বসলেন। দিনকয়েক আগে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়' নামে একটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে ; সেই কাব্যসঙ্কলনের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় রবীন্দ্রনাথ এতদূর ক্ষুব্ধ ও অশান্ত যে অবিলম্বে আরেকখানা সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ সঙ্কলন প্রকাশে তিনি আগ্রহী। অতএব সমস্ত বিরাগ-বিরক্তি দূরে সরিয়ে রেখে রবীন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে সজনীকান্তকে ডাক দিয়েছেন। সকল বিরোধ সকল সন্তাপ চোখের পলকে দূর হয়ে গেল—যেন মধ্যিখানে দীর্ঘকাল কোনও বিচ্ছেদ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৯ শ্রাবণ, সজনীকান্তকে 'বাংলা কাব্যপরিচয়' দ্বিতীয় সংস্করণ সঙ্কলনসমিতির সদস্যরূপে নিয়োগপত্র দিয়েছেন। বহু আধুনিক কবি ও কবিতাকে সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় নির্মমভাবে আক্রমণ

করেছেন; তবু রবীন্দ্রনাথ, মনে রাখা দরকার, সজনীকান্ত কর্তৃক আক্রান্ত কোনো আধুনিক কবিকে 'বাংলা কাব্যপরিচয়' দ্বিতীয় সংস্করণ সঙ্কলনসমিতির সদস্যরূপে নিয়োগ করেননি, আক্রমণকারী সজনীকান্তকেই নিয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সজনীকান্তের এই পুনর্মিলনের গোড়ার দিকে 'বাংলা কাব্যপরিচয়' সংক্রান্ত যোগাযোগ গৌণ ছিল। পরবর্তীকালে সজনীকান্ত লিখেছেন: "আমার মুখ্য কাজ তখন বিশ্বসুদ্ধ কাজের লোকের আবেদন-নিবেদনের পালা কবির সম্মুখে হাজির করা। বস্তুত পুনর্মিলনের গোড়ার দিকটায় তাঁহাকে কম উত্যক্ত করি নাই। তিনি হাসিমুখে সমস্ত আবদার শুধু সহ্য করেন নাই, চরিতার্থ করিয়াছেন। ইহার পর, তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সম্পর্ক অটুট ছিল। তাঁহার বহু শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি তাঁহাকে সাবধান ও সতর্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাকে যাঁহারা ঘোরতর অপছন্দ করিতেন তাঁহারা মৎসম্পর্কে মান অভিমান ও শাসনের ভয়ও দেখাইয়াছেন। তিনি নিজে সেই সকল গল্প আমাকে শুনাইয়াছেন কিন্তু কখনও বিচলিত হন নাই। তিনি কাহাকেও কাহাকেও এই কালে বলিয়াছেন, "সজনী আমার রাবণ ভক্ত"—ইহাও শুনিয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র, সজনীকান্তকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: "কাব্য-পরিচয়ের পরিমার্জিত রূপের জন্যে অপেক্ষা করে আছি। দ্বিতীয় খণ্ডে আদিরসের বাহনটিকেও প্রয়োজন আছে। দিলীপকুমার তাঁর কবিতার নির্বাচনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, আমি তাঁকে জানিয়েছি দ্বিতীয় সংস্করণের দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার নাম করিনি তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১১ আশ্বিন, সজনীকান্তকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: "কাব্য-সঙ্কলন উপলক্ষ্যে বুদ্ধদেব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাকে ঠাণ্ডা করতে

পার তো কোরো। এই বইয়ে সমর সেনের বিরহ তাকে বেজেছে। দিলীপ দুঃখিত। সুধীন্দ্র ক্ষাপা। তাদের কবিতা তাদের দিয়েই বাছাই করতে দেওয়া চলে কি না ভেবে দেখো।”

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২০ আশ্বিন, সজনীকান্তকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: “কোনো কোনো কবি ফরমাস করেছেন এবারে যেন আমি ভালো কবিতা বাছাই করি অর্থাৎ তাঁদের মতের অনুসরণ করি। মত কি তা জানার সম্ভাবনা নেই, থাকলেও হয়তো মানার সম্ভাবনা আরো দুঃসাধ্য। কবি-সম্প্রদায়ের মেজাজ আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু বোধ হচ্চে দেবা ন জানন্তি। যাই হোক এখন থেকে শত হস্তেন কবিনাম্। তোমার সাহস আছে—বয়সও অল্প। এই বিপদজনক অধ্যবসায় তোমাকেই সাজবে।”

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৪ কার্তিক, সজনীকান্তকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: “কাব্য-পরিচয় নিয়ে কবিদের মন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। চেম্বারলেনি পদ্ধতিতে কাটা ছেঁড়া করে এই হিটলারি সম্প্রদায়ের উষ্মা নিবারণ করতে যদি পার তা হলে আমার পরিত্রাণের উপায় হবে।”

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের কার্তিকের তৃতীয় সপ্তাহের শেষদিকে ‘বাংলা কাব্যপরিচয়’ নিয়ে সজনীকান্তের সঙ্গে একান্তে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে সজনীকান্ত লিখেছেন: “আমার সহিত একান্তে ‘বাংলা কাব্যপরিচয়’কে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘ আলোচনার পর কবি সর্বশেষে হতাশা প্রকাশ করিলেন। নানা অন্তর্ঘাতী কারণে তাঁহার মন যে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম। বেশী বাধা তাঁহার অন্তরঙ্গমহল হইতেই আসিতেছিল। আমি জানাইলাম, বাংলা কাব্যের আদি ও মধ্যযুগের নির্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে, অন্ত্যযুগও সমাপ্তপ্রায়। সকল নির্বাচনই তাঁহার সহিত পরামর্শক্রমে তাঁহার সম্মতিতে হইতেছিল। পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হইতে বিশেষ বিলম্ব

ছিল না।”

এই দীর্ঘ আলোচনার পর পুরোপুরি এক সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৫ কার্তিক, সজনীকান্তকে এক-খানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: “কাব্যপরিচয়ের আদ্য এবং মাধ্যদের শ্রাদ্ধ সমাধা হয়ে গেছে—সুতরাং তাঁরা অশান্তি ঘটাবেন না। অন্ত্যেরা ভয়াবহ। আমি শান্তিপ্রয়াসী, খর রসনার আস্ফালনে ভীত। সাহিত্যে অত্যন্ত যাঁরা প্রত্যন্তদেশীয় তাঁরাও আমাকে ভয় করেন না। সেই জন্যেই অন্ত্যবর্গের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ভার তোমারই উপরে। তোমার চর্মে খরনখরের প্রখরতা প্রতিহত হবে জানি। কবির দল বরযাত্রদলের মতো, সংকলনকর্তা কন্যাকর্তার সমপর্যায়ের। নাথা হেঁট করেও বোধ হয় তুষ্টিসাধন করতে হবে। তাই বলে মাথা ধূলোয় লুটিয়ো না। এই অনুষ্ঠানে হিটলার চেম্বারলনী পালার সাহিত্যিক রূপ দেখতে পাব আশা করচি। অর্থাৎ নিজের মানহানি করেও যতটা পার সব দাবীই মেনে চলতে হবে না। কিন্তু তাঁরা যাঁদের চার্চহিল কৃপার বলে ত্যাজ্য করতে চান তর্জনের ভয়ে তাঁদের বর্জন করাটা অবৈধ হবে। এ গ্রন্থে রবাহূত অনাহূতদেরও যথাসম্ভব পাত পেড়ে দেবার আমি পক্ষপাতী। যাই হোক এবার যে লড়াই হবে আমি দূর থেকে তাই দেখব—তাতে কৌতুক আছে।”

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ অগ্রহায়ণ, সজনীকান্তকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে একটিমাত্র বাক্য উদ্ধৃত করি: “কাব্যপরিচয়ের দ্বিতীর দেহান্তর কাল কতদূরে।”

কিশোরীমোহন সাঁতরা তখন বিশ্বভারতীর প্রকাশনী বিভাগের কর্মকর্তা। সজনীকান্ত, সম্ভবত ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের শেষার্ধে একদিন, ‘বাংলা কাব্যপরিচয়ে’র দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি তাঁর জিম্মা করে দিয়ে এসেছেন। দিনকয়েক বাদে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ‘বাংলা কাব্য-পরিচয়ে’র দ্বিতীয় সংস্করণের কথা তুলে সজনীকান্তকে বললেন—লাল

ফিতা খুলতে সময় লাগে হে। যাক, আমরা তো ধর্মের নামে খালাস।

লাল ফিতা খুলতে কত সময় লাগে কে জানে। 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্বভারতী থেকে অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। লাল ফিতা খুলতে হয়তো আরও কিছু সময় লাগবে।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সজনীকান্ত 'অলকা' নামে একখানা মাসিকপত্রের সম্পাদকত্ব করেছেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী লিখেছেন: "সজনীবাবু যখন 'অলকা'র সম্পাদক—সেই সময় 'অলকা' রবীন্দ্রনাথের কাছে দিতাম। রবীন্দ্রনাথ তখন 'মুক্তির উপায়' নাটক লিখেছেন, অভিনয়ের রিহার্সাল চলছে 'উত্তরায়ণে'। তখন নাটকটি পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে, কোথাও ছাপা হয়নি। সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ করলেন ওটা 'অলকা'য় দিতে হবে। 'অলকা'র তেমন পসার তখনও হয়নি, পাঠকসংখ্যাও 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকার তুলনায় যথেষ্ট কম। তবু রবীন্দ্রনাথ 'অলকা'য় ওটি দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন—যেহেতু সজনীবাবু চেয়েছেন।"

তখন 'অলকা'র পসারের প্রসঙ্গ অবান্তর কেননা তখন পর্যন্ত 'অলকা' প্রকাশিতই হয়নি। যাই হোক, 'অলকা'র প্রথম সংখ্যায়—১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (পৃ. ৫৭-৯৫)—প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়'।

'বাংলা ভাষা পরিচয়' নামে রবীন্দ্রনাথের একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ১৬ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে সজনীকান্তের গবেষণামূলক রচনা থেকে অংশবিশেষ ব্যবহার করেছেন।

'বনফুল' ছদ্মনামে খ্যাত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ভাগলপুরে থেকেছেন। সজনীকান্ত, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২৫ কার্তিক, বলাইচাঁদকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: "গত দুই দিন রবীন্দ্রনাথের সহিত ল্যাপটালিপটি করিয়াছিলাম—চিঠি লেখার সময় হয় নাই। রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী সংক্রান্ত

কাজ শেষ করিয়া বাংলা সাহিত্য লইয়া অনেক আলোচনা হইল—তিনি তোমাকেই অধুনাজীবিত (নিজেকে বাদ) স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে বরমাল্য দিয়াছেন ; কবিতা গল্প উপন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে আমার কাছে এক রকম উইল করিয়াই দিলেন। দুঃখ করিতে লাগিলেন, তুমি আর যাও না, তোমার সম্বন্ধে জানিবার অনেক কৌতূহল তাঁহার আছে। আমি দশ বার দিনের মধ্যে বোলপুর যাইতেছি। তোমাকেও আসিতে হইবে। তারাশঙ্কর সম্বন্ধেও তাঁহার মত খুব উচ্চ তবে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে তারাশঙ্কর একটু ক্লান্ত হইয়াছে। তিনি রবীন্দ্র পরবর্তী গল্প সাহিত্যে তোমাদের দুইজনকে ছাড়া আর কাহারও নাম করিতে পারেন না। প্রেমেন্দ্রের লেখা তিনি পড়েন নাই, মানিক সম্বন্ধে তিনি হতাশ এবং আধুনিক দলের দ্বন্দ্বে পীড়িত। আরও অনেক কথা হইয়াছে, সাক্ষাতে বলিব—তাহার কৈশোর ও যৌবনের প্রেমের কথা—বহু গুহ্য কথা শুনিলাম। আজ পর্যন্ত সেসকল কেহ শুনে নাই। তাঁহাকে পত্র দিও। আজ সকালে বোলপুরে গেলেন।"

উত্তরকালে বলাইচাঁদ লিখেছেন : "কলিকাতায় যখন আসিতাম, তখন সজনীর বাড়িতে কিম্বা হোটেলে উঠিতাম। ···সজনীকান্তের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সজনীর ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল আমাকে। সে আমার প্রকৃত হিতৈষী ছিল। ক্রমশ সে আমার ঘরের লোক হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু বেপরোয়া ছিল বলিয়া তাহাকে আরও ভালো লাগিত। ···সজনী সময় পাইলেই ভাগলপুরে আমার কাছে চলিয়া যাইত।"

সজনীকান্ত একদা প্রায়ই ভাগলপুর গিয়েছেন—উদ্দেশ্য ? বলাই-চাঁদ লিখেছেন : "উদ্দেশ্য, আমার সাহিত্য-প্রেরণার বহ্নিকে উৎসাহের হাওয়া দিয়া আরও প্রজ্বলিত করা। ও যখন আসিত, তখন আমি উহাকে আনিতে স্টেশনে যাইতাম।"

আবার রবীন্দ্রনাথ-সজনীকান্ত প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের একাধিক বেনামী রচনা সজনীকান্ত আবিষ্কার করেছেন। সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কার সম্ভবত 'অভিলাষ'।

'অভিলাষ' আবিষ্কারের ইতিহাসটুকুর মধ্যে চমৎকারিত্ব আছে।

পাতা উল্টে দেখতে-দেখতে হঠাৎ ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'অভিলাষ' নামে উনচল্লিশ স্তবকে সম্পূর্ণ দীর্ঘ একটি কবিতা সজনীকান্তের নজরে পড়ল; লেখকের নামের জায়গায় লেখা আছে—দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত।

কবিতাটি পড়ে বিচার-বিবেচনা করে সজনীকান্ত স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে 'অভিলাষ' রবীন্দ্রনাথের রচনা।

এই আবিষ্কার করে সজনীকান্ত প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। পুথিপত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন শান্তিনিকেতনে। সেদিন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ৫ অগ্রহায়ণ – ইংরেজী হিসেবে ১৯৩৯ সালের ২১ নভেম্বর। দুপুরে খাবার টেবিলে সজনীকান্ত পুথিপত্র নিয়ে বসলেন। রবীন্দ্রনাথকে বললেন—আপনাকে একটা কবিতা শোনাব, শুনুন তো।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'টি একটু আড়ালে রেখে সজনীকান্ত 'অভিলাষ' পড়তে লাগলেন।

খানিকটা শুনেই রবীন্দ্রনাথের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বলে উঠলেন—ও তো আমার লেখা হে, তুমি কোথায় পেলে?

সজনীকান্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'টি রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন।

সবটা দেখে রবীন্দ্রনাথ উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠলেন—তাই তো, এ তো দেখছি আমারই লেখা।

পরবর্তীকালে সজনীকান্ত লিখেছেন: "ওই ২১শে নবেম্বরের সন্ধ্যা আমার জীবনের একটি স্বর্ণসন্ধ্যা। রবীন্দ্র-রচনার নষ্টোদ্ধার ছাড়াও সেদিন তাঁহাকে একখানি বই ও একটি চিঠি দেখাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। দুইটি বস্তুই কলিকাতার ফুটপাথে সংগ্রহ করা।

বইটি হইতেছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া কবি বিহারী-লালের গ্রন্থাবলী, বিহারীলালের স্বাক্ষর সম্বলিত। দাতা ও গ্রহীতার গৌরবেই বইখানির চরম গৌরব নয়। বালক রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়িয়াছিলেন এবং বইয়ের মার্জিনে বিবিধ মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন। পরবর্তীকালের বিহারীলাল-শিষ্যের বিহারীলাল-কাব্যে ইহাই প্রথম প্রবেশদ্বার। চিঠিখানি পাইয়াছিলাম রবীন্দ্রাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের স্বব্যবহৃত আত্মজীবনীর মধ্যে। প্রথম বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাইয়ে যে কিশোরী রবীন্দ্রনাথকে ভাল ইংরেজী শিখাইতে বসিয়া নিজেই ভাল বাংলা শিখিয়াছিলেন ও সেই সময় 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত) যিনি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে "নলিনী" নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ কিছু কবিতা-গানও রচনা করিয়াছিলেন, চিঠিটি ১৮৭৮ সনে তিনিই লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের কোন অগ্রজকে। তিনি বোম্বাই-য়ের বিখ্যাত ডাক্তার দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের কন্যা অ্যানা। বস্তু দুইটি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রায় আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং সেই সন্ধ্যাতেই স্বহস্তঅঙ্কিত একখানি ছবি, তাঁহার ব্যবহৃত একটি আলখাল্লা এবং 'তপতী' নাটকে অভিনয়কালে তৎকর্তৃক পরিহিত শিরস্ত্রাণটি আমাকে দান করিয়া ধন্য করেন। রচনাপঞ্জী আবিষ্কার সম্পর্কে আমার কৃতিত্বের একটা পাকা সার্টিফিকেটও স্বহস্তে লিখিয়া দেন।"

রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: "শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কৈশোরের বেনামী রচনা-গুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা "অভিলাষ" তাঁহার অভিনব আবিষ্কার। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম চারটি নাটকের অধিকাংশ কবিতা ও গান যে আমার রচনা তা সজনীকান্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। হিন্দুমেলায় দিল্লীদরবার সম্বন্ধে আমার পঠিত কবিতাটি "স্বপ্নময়ী"তে আত্মগোপন

করেছিল সেটাও সজনীকান্তের ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে।…”

এই নষ্টোদ্ধারের ফলে রবীন্দ্রনাথ এতই খুশি যে সজনীকান্ত অবিলম্বে ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’র অন্যতম সম্পাদক হয়েছেন।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের ‘শনিবারের চিঠি’তে রবীন্দ্রনাথের ‘শেষ কথা’ নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে; সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: “গত ৩০ অগ্রহায়ণ তারিখের ‘দেশ’ পত্রিকায় “ছোটগল্প” নামে রবীন্দ্রনাথের যে গল্পটি বাহির হইয়াছে “শেষ কথা” তাহারই আদি রূপ। কিন্তু আদি রূপ হইলেও ইহাতেই অচিরার স্বরূপ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবত কবি বাংলাদেশের নীতিপরায়ণ পাঠকদের কথা মনে রাখিয়া বেচারাকে মেয়েজ্যাঠা অপবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই পরে তাহার উক্তি ও কীর্ত্তির অনেক সংস্কারসাধন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ‘শেষ কথা’র অচিরাকেই অধিকতর লোভনীয় জ্ঞান করিয়াছি। একই বিষয়ের এই দুইটি শিল্পকার্য্যকে পাশাপাশি মিলাইয়া দেখিলে পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের কিছু রহস্যের আভাস পাইবেন।” (‘শনিবারের চিঠি’, ফাল্গুন, ১৩৪৬, পৃ. ৬৫৫)

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখের ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য’ নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে ঈষৎ অংশ উদ্ধৃত করি: “সাহিত্যকে বাঙালী মোটামুটি ব্যবহারিক জগতের বাইরেই রেখেছে। লোক-সাহিত্যে নিশ্চয় দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন ঘটেছিল, কিন্তু গত শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই তার প্রতিপত্তি এতই কমে যায় যে আজ তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গবেষণার প্রয়োজন। এই অ-ব্যবহারিকতা রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনায় অ-পার্থিব অ-স্বাভাবিকতায় যে পর্য্যবসিত হয়নি সেজন্য সত্য, আনন্দ, মঙ্গল, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সার্বজনীন সাধারণ মূল্যের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে তাঁর গভীর বিশ্বাসই দায়ী।”

ধূর্জটিপ্রসাদের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী একটি প্রবন্ধ লিখে সজনীকান্তকে পাঠিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৪ জ্যৈষ্ঠ, সজনীকান্তকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: "শুনছি সুধাকান্ত ধূর্জটির মুখরতার বিরুদ্ধে তোমাকে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছে। এ নিয়ে আমার মনে দ্বিধা আছে। যদিও তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছি তবু লোকে বলবে আমি এই রচনার "পৃষ্ঠপোষক" এবং এই সূত্রে শনিগ্রহের সঙ্গে রবিগ্রহের দেনাপাওনা চলছে। তোমাদের সকলের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ নিষ্কাম হয় এই আমার কামনা। তুমি ভেবে দেখো এবং যেখানে আমার কোনো সমর্থন আছে সেটা বর্জন কোরো। ধূর্জটির লেখায় আমার একমাত্র বিরক্তির কারণ…তার ইস্কুল মাস্টারি মুরুব্বিয়ানা। …কিন্তু রুচির ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা সহ্য করতেই হয়। যাই হোক আমাকে শান্তিতে থাকতে সাহায্য কোরো—বয়েস হয়ে গেছে।"

সুধাকান্তের প্রবন্ধটি সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেছেন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে। প্রবন্ধটি থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি:

"অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য'—শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিলাম, বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত তাহা পাঠ করিতে বসিলাম। বার বার তিনবার ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াও অধ্যাপক মহাশয়ের সঠিক বক্তব্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। যেটুকু বুঝিতে পারিলাম, তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সম্যক পরিচয় সত্য হইয়া দেখা দেয় নাই, অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতের সুখদুঃখের সহিত মানুষের যে সমাজজীবন বিজড়িত, সেই মানুষ জীবনের সত্যকার পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে নাই। দুঃখের বিষয়, অধ্যাগক মহাশয়, সঙ্গত ভাবেই হউক আর অসঙ্গত ভাবেই হউক, তাঁহার মন্তব্যের পরিপোষকতায়, কোনও দলিল বা নজির দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। এই হতভাগ্য দেশেই এই রকমের সাহিত্যিক-মোড়লি করা সম্ভব। মোড়লি করিবারও একটা অধিকার থাকা চাই।

গাঁয়ে সেই ব্যক্তি সত্যকার মোড়লি করিয়া বিচার্য্য বিষয়ে একতরফা রায় দিতে পারেন, যাঁহার গাঁয়ে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহার বাক্যকে নির্ব্বিচারে সকলে বেদবাক্য তুল্য গ্রহণ করিতে পারে, কোনও রকমের দলিল প্রমাণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া। সাহিত্য-রাজ্যে অধ্যাপক মহাশয় সেরূপ প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় লাভ করেন নাই, সাহিত্যিক হিসাবে তিনি স্বনামধন্যও নহেন। কাজেই তাঁহার পারিভাষিক শব্দহুঙ্কারের দ্বারাই তিনি যাহা বলিবার তাহাই বলিবেন ; তর্ক, যুক্তি এবং প্রমণাদির ধার ধাবিবেন না—এরূপ ভাবাটা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছে। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ক্লাসে যাহা ইচ্ছা মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, সেখানে হয়তো বাধ্য ছাত্রদের পক্ষে নির্ব্বিচারে সে মন্তব্য শোনা সম্ভব, কিন্তু ক্লাস রুমের বাহিরের জগৎটা সে রকম নহে এবং সে জগতের লোকেরাও নির্ব্বিচারে সব কথা শুনিতে এবং মানিয়া লইতে বাধ্য নহে।...

"কথায় বলে, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ—সীতে কার ভার্য্যে'। অর্থাৎ কেহ সমগ্র রামায়ণ পাঠ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই, সীতা কাহার ভার্য্যা। এক্ষেত্রেও ব্যাপার তাহাই, এত বড় প্রবন্ধ লিখিয়াও, এত সমাজতত্ত্বের, মনস্তত্ত্বের ও পারিভাষিক শব্দজ্ঞানের আলোচনা করিয়াও, ব্যবহারিক ও অব্যবহারিক জগতের বচন কপ-চাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্য কিনা আধুনিক সাহিত্যের মূল্য নাই। তবু এই প্রবন্ধ এই কাগজের দুর্মূল্যের বাজারে 'পরিচয়ে' ছাপানো হইল! আমরাও এই প্রসঙ্গে শেষ কথা বলি। 'পরিচয়ে' এই প্রবন্ধের ছাপা হইবার কারণ, অধ্যাপক মহাশয় বলিতে-ছেন, 'মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে গেলে অন্তরে বিশ্লেষণবুদ্ধি ও তার যুক্তিতে বিশ্বাসকে অধিষ্ঠিত করতে হবে।.... আধুনিক কোনো সাহিত্যিকের পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তের সন্ধান পাইনি,—এক সুধীন্দ্র দত্ত ছাড়া।' এর পর এই প্রবন্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে টিপ্পনী বা টীকা নিষ্প্রয়োজন, কেন না সুধীন্দ্রবাবু 'পরিচয়ে'র সম্পাদক।"

শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার কাব্য ও নিবন্ধের
বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছে।
পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার অল্পবয়সকৃত রচনা
"প্রতিশোধ" তাঁহার সন্ধানের আবিষ্কার। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে
আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম নাটকটি
নাটকের অধিকাংশ রচিত হয়, গানগুলো আমারই রচনা তাও স্বীকার করে
তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। বিশেষভাবে, দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার লেখা
'স্বপ্নময়ী সুন্দরী'তে অযোগ্যতার পরিচয় সেটাও স্বীকারের
যোগ্য হয়ে পড়েছে। সজনীকান্ত স্বয়ং লিখিত আলোচনায়
প্রমাণগুলি নিঃসংশয়ে দেখায়। কিন্তু পরবর্তী কালের রচনার
সম্বন্ধে তাঁর নিঃসংশয় হতে পারেন নি। প্রথম দিকের কবিতা
ও গল্পগুলো তাঁর ইত্যাদি খুঁজে বের করেছেন এবং সেগুলো
বিশেষ করে আমার কৌতুক বোধ করছি। তবুও এর সম্বন্ধে
সেগুলোর সাক্ষী কেবল আমি নিজে, অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে
সাক্ষ্য প্রমাণের যোগ আমার সন্দেহ হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১।১১।৩৮

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ একদিন সজনীকান্তকে বললেন—যে নিজের কৃতিত্বে সকলের কাছে সম্মানশ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য তোমরা তার ছোটখাটো দোষ বার করে তাকে নীচে নামাতে চাও, যে উপরে উঠতে পারে তাকে উঠতে দিতে চাও না। এতে ক্ষতি হয় দেশের। রামানন্দবাবুর মতো লোক বাংলায় কজন আছেন, তিনি যা দিচ্ছেন দেশকে তার ঋণ আগে শোধ করো। তাঁর সম্বন্ধেও তোমাদের বিরূপ ভাব।....

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে সজনীকান্ত একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সচিব সুধাকান্তকে জানালেন—সুধাদা, কবিকে বলবেন তাঁর তিরস্কার আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। আর কখনও রামানন্দবাবু সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাকর কিছু লিখব না।

সুধাকান্ত সেই চিঠি দেখালেন রবীন্দ্রনাথকে। খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন—দেখিস, সজনী আমার কথা রাখবে।

মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে সজনীকান্ত একদা সভাপতি হয়ে বাঙলাদেশের জেলায়-জেলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন। অনেকদিন পর সজনীকান্ত, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১৮ জ্যৈষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখেছেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২০ জ্যৈষ্ঠ, সজনীকান্তকে লিখেছেন: "দীর্ঘকাল তোমার কাছ থেকে চিঠির উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্ন ছিলুম। উত্তর পেয়ে যে উদ্বেগ কমল তা বলতে পারিনে। মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় তুমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলে। নিজের প্রতি এই অত্যাচার কী করে তোমার দ্বারা সম্ভব হোলো ভেবে পাইনে। চুপ করে থাক এখন কিছু দিন, এডিটরি রাজদণ্ড দাও আর কারও হাতে। আমার চিঠির উত্তর দিতে হয় দিয়ো মনে মনে। সাব-এডিটরকে বলে দিয়ো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুহৃজ্জনের কোন লেখা ছাপিয়ে বঙ্গ-সাহিত্য-সরোবরের তলার পাঁক ঘুলিয়ে দিয়ে ভারতীর পদ্মাসন যেন দুলিয়ে না দেয়। শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর এই কামনা করি।"

সজনীকান্তের অসুখ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিতভাবে জানতে আগ্রহী—খবর পেয়ে সজনীকান্ত নিজের অসুখের ইতিহাস লিখে পাঠালেন। রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবত ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২৩ জ্যৈষ্ঠ, সজনী-কান্তকে লিখেছেন :

"সকল বিষয়েই আমি আনাড়ি, অশিক্ষার উপরে কাজ চালিয়ে দিই, সব সময় ধরা পড়িনে। আমার ডাক্তারির পক্ষে বলবার কথা এই যে, সাংঘাতিকতায় আমার ওষুধ ব্যামোকে ছাড়িয়ে যায় না। বায়োকেমিক বইটা ঘেঁটে দেখছিলুম যে ঐ চিকিৎসার মতে নেট্রাম সাল্ফ ডায়াবিটিসের প্রধান ওষুধ। তুমি এক কাজ কোরো। বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির 'টুয়েল্‌ভ্ টিস্যু রেমেডিজ' আনিয়ে নিয়ো, বলাইয়ের সাহায্যে সেটা ঘাঁটিয়ে নিয়ো। বায়োকেমিক ওষুধের গুণ এই যে হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধের মতো এ শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। অন্য ওষুধের সঙ্গে এর ব্যবহার চলে, অন্তত আমি তো ব্যবহার করেছি। দিনে তিনবার খেলে আপত্তি করে না, অ্যাকিউট ব্যাধিতে সেইটেই ব্যবস্থা।

"আমার মনের অবস্থা কর্মবিমুখ, আমার গ্রহ আমাকে খাটিয়ে নেয়, বাজে খাটুনিই বেশি। ইতি তারিখ পাঁজি দেখে ঠিক করে নিয়ো।"

সজনীকান্ত অতঃপর বায়োকেমিক বিদ্যা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছেন, যথেষ্ট সুফলও পেয়েছেন। সজনীকান্ত এ-খবর রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৬ আষাঢ়, সজনীকান্তকে লিখেছেন : "আমার ওষুধে ফল পেয়েছ। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন। যে বয়সে স্বভাবতই অন্য খ্যাতির পথে বালিচাপা পড়ে, সেই বয়সে তিনি একটা নতুন পথ খুলে দিলেন। আমার জীবন-চরিতের শেষ অধ্যায়ে এই খবরটা দিয়ে যেতে পারবে। এ বিদ্যেটা সরস্বতীর এলাকায় নয়, এটা ধন্বন্তরীর মহলে—সেখানে রস নেই, রসায়ন আছে। সাইকলজির নাড়ি যাঁরা টেপেন এখানকার নাড়ির খবর তাঁদের হাতে নেই। (বলাইয়ের প্রতি কটাক্ষ করচিনে, পদ্মগন্ধে আয়োডোফর্মের গন্ধ

বেমালুম মিশে গেছে তাঁর নাসারন্ধ্রে।) যাক তোমার মাথাটাকে চাঙ্গা করবার জন্যে আমার বায়োকেমিক বিধান হচ্ছে কেলিফস সিক্স এক্স। পূর্বের ওষুধের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে, দিনে পাঁচটা বড়ি, অন্তত তিনবার সেবনীয়।"

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১২ শ্রাবণ. সজনীকান্তকে লিখেছেন :

"তোমার বায়োকেমিক বন্ধুর [ইংরেজিতে সুবৃহৎ বায়োকেমিক চিকিৎসা-গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন মিত্র] উদ্দেশে একখানা প্রশস্তি-পত্র লিখে পাঠালুম। এখানে তোমার যে বন্ধুটি [সুধাকান্ত] আমার সিংহাসন আগলিয়ে থাকেন ইংরেজিতে লেখবার জন্যে তোমার হয়ে তিনি আমাকে তাগিদ জানালেন। গৌড়ীয় সাহিত্যমণ্ডলীর প্রতি-নিধি আমি এমন দুর্নীতির কাজ পারৎপক্ষে করিনে। আমার পক্ষে এর পরিণাম ভাল হবে না। আমার কলমের মুখে এ রকম বিধার্মিক কালি পড়াতে আমি লজ্জিত আছি। যদি এতে কারো কোনো উপকার হয় ভেবে এই অনাচার মেনে নিলুম।

"তোমার কাজের মহলে একটা ডাক্তারি খিড়কির দরোজা হঠাৎ খুলে গেল—এর জন্যে দায়ী আমি। আশা করি কোনো পরিতাপের কারণ ঘটবে না। ভাল আছ বলে আন্দাজ করছি। চুপচাপ থাকাটা একটা খবর—ওটা আরো কিছুদিন বড় হেডলাইনে জাহির কোরো।

"আমার দিন চলছে একঘেয়ে সুরে, অবন্ধুর পথে।"

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২৫ ভাদ্র, সজনীকান্তকে লিখেছেন : "শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। ···কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হয়েছে। অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার ইচ্ছা করচি। যাবার মুখে কলকাতায় দেখা হতে পারবে। নইলে তুমি যদি এখানে এসো সেও একটা উপায় আছে।"

এই চিঠি লেখার দিনকয়েক পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে এলেন। সজনীকান্ত খবর পেলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাক্ষাৎ পেতে ইচ্ছুক। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১ আশ্বিন বিকেলে সজনীকান্ত গেলেন

জোড়াসাঁকোয়। উত্তরকালে সজনীকান্ত লিখেছেন: "বেলা চারিটায় পৌঁছিলাম, তাঁহাকে (রবীন্দ্রনাথ) সুস্থ দেখাইতেছিল না, চোখ এবং কান খুবই খারাপ হইয়াছে, তবু দেখি প্রস্তুত হইয়া আছেন—সন্ত-লেখা "ল্যাবরেটরি" গল্প আমাকে পড়িয়া শুনাইবেন। আমি শঙ্কিত হইলাম, তাঁহার পরিজনদের কাছে কেমন একটা সঙ্কোচও বোধ হইতে লাগিল, তবু শুনিতে হইল। দেখিলাম, এই বয়সে অসুস্থ শরীরে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এক নারীচরিত্র মোহিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। আমার কথায় কবি ছেলেমানুষের মত খুশী হইয়া উঠিলেন।"

সজনীকান্ত, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২০ পৌষ, শান্তিনিকেতন গিয়েছেন; রবীন্দ্রনাথকে অনেকটা সুস্থই দেখে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প' প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। 'গল্পসল্প' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একখণ্ড বই সজনীকান্তকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর মতামত জানতে চেয়েছেন। সজনীকান্ত তখন অসুস্থ; তবু মন দিয়ে বইখানা পড়েছেন এবং নিজস্ব মতামত রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১৪ জ্যৈষ্ঠ, সজনীকান্তকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: "গল্পসল্প তোমার ভালো লেগেছে শুনে আমি খুশী হলুম। ওরকম খুচরো গল্প সাধারণত কারো কানে পৌঁছায় না, কিছু পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তুমি যে তার ঠিক মর্মটি ধরতে পেরেছ এতে তোমাকে সাহিত্যের সমজদার বলে চেনা গেল।"

রবীন্দ্রনাথ দিনে-দিনে শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়ে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতন যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু নিজের শরীরের অবস্থা এমন যে সজনীকান্ত একা-একা অতদূর যেতে ভরসা পেলেন না; দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২০ জ্যৈষ্ঠ, সকালের ট্রেনে রওনা হলেন—শান্তিনিকেতনে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করলেন। রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,

সবান্ধব সজনীকান্তের আদর-আপ্যায়নের জন্য সচিব ও অনুচরদের বিপন্ন করে তুললেন। সেদিনই বিকেলের ট্রেনে সজনীকান্ত ফিরে এলেন।

রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২১ জ্যৈষ্ঠ, সজনীকান্তকে লিখেছেন: "সজনী, তুমি ক্ষণকালের জন্যে এসে আমাদের খুশী করে দিয়ে গেছ। তোমার যে রকম ভঙ্গুর অবস্থা তাতে আমি এ প্রত্যাশা করিনি। প্রতীক্ষা করে রইলুম সুস্থ অবস্থায় আবার সম্মিলন হোতে পারবে। আমি আজ অপেক্ষাকৃত কিছু ভালো আছি। তোমার বন্ধুরা খুশি হয়ে গেছেন, এই বর্ষার দিনে তাতে সুধাকান্তর মনকে মুখরিত করে তুলেছে। আশা করি সদলবলে ঘরে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পেরেছ এবং গৃহিণীর ভৎর্সনা দুঃসহ হয়নি।"

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শরীরের অবস্থা দিনে-দিনে খারাপ হতে থাকল; ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ৯ শ্রাবণ তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে আসা হল।

পরদিন দুপুরে সুধাকান্ত টেলিফোন করে সজনীকান্তকে বললেন—যদি সজ্ঞানে কবিকে দেখতে চান এক্ষুনি আসুন।

সজনীকান্ত তখনই গেলেন জোড়াসাঁকোয়। রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করলেন। রবীন্দ্রনাথ বসতে বললেন সজনীকান্তকে। নিজেই অবনীন্দ্রনাথের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ বললেন—ওর জন্মদিন উপলক্ষে তোমরা ঘটা করে উৎসব কোরো। দেশের রুচির হাওয়া ও একলাই বদলে দিয়েছে—এত বড় প্রতিভা ওর। একটা বড় সম্মান ওর প্রাপ্য।

প্রণাম করে বিদায় নেওয়ার কালে সজনীকান্ত বললেন—আপনি শিগগির সুস্থ হয়ে উঠুন।

রবীন্দ্রনাথ ম্লান হেসে কষ্টের সঙ্গে বললেন—সেটা কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে!

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষের চারদিন সজনীকান্ত দিবারাত্র আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর আশেপাশেই ছিলেন। শেষের তিনদিন

রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে ছিলেন না।

অনেক আগেই বলা উচিত ছিল, 'মাইকেলবধ-কাব্য' নামে সজনী-কান্তের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'তে—১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বহুদিন পর 'মাইকেলবধ-কাব্য' পুস্তকাকারে (দ্রষ্টব্য—সজনীকান্ত দাস: ভাব ও ছন্দ, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ৮৩-৯৬) প্রকাশকালে সজনীকান্ত লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক মাইকেল-বধ উপলক্ষ্যে ইহা ('মাইকেলবধ-কাব্য') রচিত হইলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রচনাটিকে সপ্রশংস আশীর্বাদ জানাইয়া-ছিলেন। পরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাকে জানান, একবার মাঘোৎসবে রচিত আমার কয়েকটি গান শুনিয়া পিতা আমাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, দেশের রাজার কাছে যদি এ দেশের সাহিত্যিকদের আদর থাকিত তাহা হইলে কবিকে তাহারা পুরস্কার দিত; রাজার দিক হইতে সে সম্ভাবনার অভাবে তিনিই সে কাজ করিলেন। মাইকেলবধ-কাব্যে তুমি যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছ তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল তোমাকে পুরস্কৃত করা; সে সম্ভাবনাও যখন নাই, তখন পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় আমি ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তোমাকে পুরস্কার দিব। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এত বড় আশ্বাস সত্ত্বেও কবির জীবিতকালে ইহা পুস্তকা-কারে প্রকাশ করা হয় নাই। আজ অহমিকার মত শুনাইলেও কথাটার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।"

আবার মোহিতলাল-সজনীকান্ত প্রসঙ্গে চলে যাই।

মোহিতলাল মজুমদার, ১৩৫১ বঙ্গাব্দের ৪ কার্তিক, লিখেছেন: "সজনী আমার ছোট ভাই-এর মত, তাছাড়া একরকম সাহিত্যিক শিষ্যও বটে। ....যারা সাহিত্যচর্চা করে অর্থাৎ লেখক হতে চায় তাদের অনেকে তার ওখানে ভিড় করে; তাদের লেখা প্রকাশ করা, ভূমিকা লিখে দেওয়া, এইসব নিয়ে তাকে খুবই ব্যস্ত করে। 'শনি-

বারের চিঠি'র পরিচালনা ও সম্পাদনা এবং নানা সাহিত্যিক-অনুষ্ঠান উৎসবে নেতৃত্ব করাও তার একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্পর্কের যে সামাজিকতা তাই তার প্রকৃতি ও প্রতিভার অনুকূল; দেশেব যুবকসমাজকে কোন একটা ধর্ম বা সত্যের পথ নির্দেশ করা, তার সাধ্যাতীত না হলেও, সে সুযোগ বা সুবিধা তার নেই। তাছাড়া তার মত ব্যস্ত মানুষ খুব কম আছে। একদিকে সামাজিকতার অসংখ্য রকমের দাবী, তার উপর সে একজন সংসারী ও বিষয়ী লোক—প্রকাণ্ড সংসার. একসঙ্গে দুই তিনটি ব্যবসায় এবং তার উপর নানা সাহিত্যিক পরিশ্রম। ···সে যা করছে, অন্ততঃ যেটুকু করবার সুযোগ সে পাচ্ছে তাই যথেষ্ট। 'শনিবারের চিঠি'খানা যে সে দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেছে এবং তাকে যখন একটা অবশ্যপাঠ্য পত্রিকা করে তুলতে পেরেছে (বর্তমানে তার গ্রাহক সংখ্যা আর সকল পত্রিকার চেয়ে বেশি) সেইটাই তার এক বড় কীর্তি। সে একজন প্রতিভাবান Journalist এবং অতিশয় সামাজিক ব্যক্তি—সেই সাহিত্যিক গুণের সঙ্গে সামাজিকতার গুণ যুক্ত হয়েছে বলেই সে বর্তমানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন একটা স্থান অধিকার করেছে।"

'শনিবারের চিঠি'র ১'৫১ বঙ্গাব্দের মাঘে মোহিতলাল মজুমদারের একটি ধারাবাহিক রচনার শেষ কিস্তি 'বাংলার নবযুগ: পরিশিষ্ট রবীন্দ্রনাথ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই শেষ কিস্তি প্রকাশের অনেকদিন আগেই সজনীকান্তের আচার-আচরণ থেকে মোহিতলাল সাব্যস্ত করেছেন যে 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর রচনা প্রকাশে 'সজনী-কান্তের আর আন্তরিক আগ্রহ নেই। সেসময়ে মোহিতলালের বদ্ধমূল বিশ্বাস—সজনীকান্ত নিজের সাহিত্যিক বন্ধুমণ্ডলীর কাছে মোহিতলালের কাহিনী একেবারে তুচ্ছ ও অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছেন; সজনীকান্তের সাহিত্যিক বন্ধুমণ্ডলী সজনীকান্তকেই 'শনিবারের চিঠি'র একমাত্র প্রধান ও প্রতিষ্ঠাতা বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের চোখে মোহিতলাল অন্যতম বিশিষ্ট লেখক মাত্র; আগে সজনীকান্ত

বাঙলার সকল সাহিত্যসভায় একচ্ছত্র সভাপতিত্ব লাভ করেছেন, পরে গান্ধীবাদী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করে সাহিত্য ও সুবিধাবাদ, সভাপতি ও ধনপতি এ-দুইয়ের বিরোধভঞ্জন করেছেন; ভাব গোপন করবার এবং ব্যবহারে বাহ্যিক ত্রুটি নিবারণ করবার কলাকুশলতায় সজনীকান্ত অনন্যসাধারণ; মোহিতলালের সঙ্গে সজনীকান্ত সর্বসম্পর্ক ছিন্ন করতে উৎসুক, এমন কি কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু ব্যাপারটি তিনি এমনভাবে সাধন করতে উদ্যোগী যেন তার সকল দোষ মোহিতলালের উপরেই পড়ে- -অন্তত কেন যে এমনটা হল বাইরে তা প্রকাশ না পায়, তাহলে সজনীকান্তের সামাজিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

'শনিবারের চিঠি'র ১৩৫১ বঙ্গাব্দের মাঘে মোহিতলালের ধারাবাহিক রচনার শেষ কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার চার-পাঁচ মাস পরের কথা। উত্তরকালে মোহিতলাল একটি প্রবন্ধে লিখেছেন :

"চারি পাঁচ মাস পরে একদা সজনীকান্ত কলিকাতায় আমার এক বন্ধুর বাসায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—তাহার কারণ আমি আর তাঁহার দ্বারস্থ হইতে ইচ্ছুক ছিলাম না। ইহার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ব্যাপারটাতে গোপনে ধামাচাপা দেওয়া—আমার মনে যাহাতে কোন ক্ষোভ না থাকে সেজন্য অনেক বিনয় ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, আমার লেখার জন্য আগ্রহ করিলেন এবং আমি যে আর লিখিব না তাহা বুঝিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

"সেখানে আরও দুই একজন উপস্থিত ছিলেন, আমি সেই সুযোগে সাক্ষী প্রমাণ ঠিক রাখিবার জন্য, সজনীকান্তের আন্তরিকতা পরীক্ষাচ্ছলে একটা অভিযোগ করিলাম। এ অভিযোগ পূর্বেও অনেকবার করিয়াছি, তাহাতে সজনীকান্তের ধর্মবুদ্ধির পরিচয় বহুবার পাইয়াছি। 'শনিবারের চিঠি'তে আমার রক্ত-জল করা বহু প্রবন্ধ আমি চিরকাল দান করিয়া আসিয়াছি—তাহার প্রতিদান আমি কখন কামনা করি না—···। কিন্তু তথাপি সামান্য একটু অধিকার দাবী করিয়া আমি

আমার বইগুলির একটা বিজ্ঞাপন উহাতে নিয়মিত ভাবে দিবার অনুরোধ বহুবার জানাইয়াছি। সে অনুরোধ কখনও সম্যক বা নিয়মিতভাবে পালিত হয় নাই। আমি এইবার পুনরায় সেই কথা উত্থাপন করিলাম, এবং 'চিঠি'তে আমার বইগুলির বিজ্ঞাপন যেন নিশ্চিত দেওয়া হয় ইহাও বিশেষ করিয়া জানাইলাম। আমি জানিতাম এ অনুরোধ রক্ষিত হইবে না—বিশেষতঃ এই অবস্থায়; কারণ সজনীকান্ত এখন আমাকে প্রায় স্পষ্ট ভাবেই 'চিঠি' হইতে বিদায় লইতে বলিতেছেন—কেবল মুখে একটা ভদ্রতার ভাণমাত্র না করিলে নয়, তাই এইসব অভিনয়। আমি সেই সাক্ষীদিগকে তখনই বলিয়াছিলাম—সজনীকান্ত এইবার একটা বড় সুযোগ পাইবেন, আমার এ অনুরোধ লঙ্ঘনের দ্বারাই তিনি পরোক্ষে আমাকে জানাইয়া দিবেন—তিনি সত্যই আমার সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। অথচ মুখে কিছুই বলিতে হইল না—এতদিনে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিতের সুযোগ পাওয়া গেল। আমি তাহাই চাহিয়াছিলাম—মুখে তিনি কিছুই বলিতেন না, এইবার আচরণ-ঘটিত একটা অতিশয় সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলিবে এবং তাহা কাহারও নিকট ঢাকা দেওয়া যাইবে না। সজনীকান্ত সেই বিজ্ঞাপন দিলেন না অর্থাৎ আমার মুখের উপরে চাবুক মারিলেন। কেহই কিছু জানিল না—'শনিবারের চিঠি' এতদিনে আমাকে পদাঘাতের দ্বারা বহিষ্কার করিয়া দিল। ততদিনে সজনীকান্ত কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘ গঠন করিয়া—জনগণচিত্তে উত্তুঙ্গ আসন অধিকার করিয়াছেন; 'শনিবারের চিঠি'তে 'গান্ধী পরিকল্পনা' 'হরিজন সেবা'র মোচ্ছব লাগিয়া গিয়াছে।"

মোহিতলালের এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে উত্তরকালে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন :

"প্রবন্ধটি আমি পড়ে দেখেছি খুব যত্ন করে। আক্রমণের আয়োজন দেখে ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু পড়ে দেখি লেখক সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য বা স্পষ্ট অভিযোগ কিছুই ছিল না, নিজেকে

শুধু উপহাসের পাত্র করে তুলেছেন ওটা লিখে। মোহিতবাবু শেষ বয়সে কিছু inferiority complex-এ আক্রান্ত হওয়াতেই এটি ঘটেছিল।

"মোহিতবাবুর প্রতি সজনীকান্তের কোনও বিদ্বেষ ছিল না। মোহিত-বাবুরও থাকবার কথা নয়, কিন্তু শেষে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছিল, তাই নিজেকে সজনীকান্তর দ্বারা অবহেলিত মনে করতেন। সজনীকান্তেরও নিজের প্রতি কিছু দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তার জন্য অগ্রজোপমের হাতে ওই বিদ্বেষ তাঁর প্রাপ্য ছিল না।"

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মোহিতলালের সঙ্গে সজনীকান্তের সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। এই পূর্ণচ্ছেদকে সজনীকান্ত নিজের সাহিত্যজীবনের সর্বাধিক ট্রাজেডি হিসেবে গণ্য করেছেন।

মোহিতলাল, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ৪ বৈশাখ, লিখেছেন: " 'শনিবারের চিঠি' আমাকে যেভাবে বহিষ্কৃত করিয়াছে তাহা আমার এই জীবনের একটা বড় আঘাত।"

মোহিতলাল, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ২৩ জ্যৈষ্ঠ, লিখেছেন: "দেশের কোন সুপ্রচারিত পত্রিকায় আমার একটি লেখাও প্রকাশিত হয় না, আমাকে উহারা বয়কট করিয়াছে। ইহার মূলে আছে সজনীকান্ত দাস। সেই কলিকাতার সমস্ত পত্রিকা ও প্রেসকে শাসন-দমন করিতেছে এবং গভীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া আমাকে সর্বপ্রকারে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। অথচ কেহই তাহা সন্দেহও করে না। এমনই কূটকৌশল তাহার। আমার মৃত্যু না হইলে সে স্বস্তি পাইবে না।"

সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়ার পর সজনীকান্ত সম্বন্ধে মোহিতলাল একাধিক নিন্দাবাক্য লিখেছেন। কিন্তু মোহিতলাল সম্পর্কে সজনীকান্ত কোনোদিন কোথাও একটিও নিন্দার অক্ষর লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

অসুস্থ মোহিতলাল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের

৬ শ্রাবণ।

পরদিন সজনীকান্ত হাসপাতালে এসেছেন। কিন্তু মোহিতলাল যদি অসন্তুষ্ট হন এবং কোনও অঘটন ঘটে—একথা ভেবে সজনীকান্ত হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি।

হাসপাতালের কাগজপত্রে মোহিতলালের চিকিৎসার আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে নিজের নাম লিখতে চেয়েছেন সজনীকান্ত। নানারকম বিবেচনার ফলে তাঁকে নিরস্ত করা হয়েছে।

মোহিতলালের একজন ভক্তকে সজনীকান্ত বলেছেন—যথাসাধ্য চিকিৎসার যেন কোনও ত্রুটি না হয়। টাকার দরকার হলেই বলবে।

মোহিতলাল মারা গেছেন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ। অতঃপর সজনীকান্ত লিখেছেন: "'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ আটাশ বৎসরের নিবিড় সম্পর্ক শেষের দিকে প্রধানত রাজনৈতিক কারণে খণ্ডিত হইয়াছিল। তিনি বর্তমান হিন্দীভাষী কংগ্রেসী শাসনকে বঙ্গনিসূদন জ্ঞান করিয়া তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'শনিবারের চিঠি' তাঁহার এই উগ্র মতবাদ অনুসরণ করিতে পারে নাই, সুতরাং বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।....'শনিবারের চিঠি'কে জীবন ও জগৎকে লঘু করিয়া দেখিবার আধুনিক ছেলেমানুষী হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি চিন্তাপ্রবণ প্রবীণের প্রতিষ্ঠা দান করেন; তিনি ইহার সহিত এমনই জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সাধারণ পাঠক মোহিতলাল বলিতে 'শনিবারের চিঠি' এবং 'শনিবারের চিঠি' বলিতে মোহিতলালকেই বুঝিত। শেষ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও তাঁহার বিয়োগ-বেদনা 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে মর্মান্তিক, সে বেদনা প্রকাশের ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

কথায়-কথায় বহুদূর চলে এসেছি। এবার অন্যদিকে যাওয়া দরকার। সজনীকান্ত ও তাঁর সমসাময়িক বিরোধীপক্ষ বিষয়ে অন্তত দু-চার কথা বলে রাখা ভাল।

বিরোধীপক্ষের বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্রে, একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি: " 'শনিবারের চিঠি'র নাম আজকের দিনে কে না জানে?...'শনিবারের চিঠি' দেশের লেখকের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। করবেই বা না কেন? বাঙলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক যা'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি যা'কে সস্নেহ সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছেন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা যা'র পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা—সে পত্রিকার কিছুমাত্র মর্য্যাদা বা মূল্য নেই, এ-কথা কেমন করে বলি? 'চিঠি'র লেখকদের রচনাভঙ্গীর চাতুর্য্য, জ্ঞানের অদ্ভুত বিস্তার, কোনো বিশেষ লিখনভঙ্গী হুবহু অনুকরণ করবার আশ্চর্য্য শক্তি, হাস্যরসের উপর অধিকার—এসব কাকে না মুগ্ধ করেছে? প্যারডি করায় এঁদের বেশ হাত আছে, কবিতা লিখতে গিয়ে এঁদের ছন্দপতন হয় না, এঁরা অনায়াসে অজস্র লিখতে পারেন, এসব গুণ কি উপেক্ষণীয়? এঁদের বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু এঁদের পক্ষে যা-যা বক্তব্য আছে, তা-ও এড়িয়ে যাওয়া ভদ্রতাসঙ্গত নয়।"

বিরোধীপক্ষের মতে 'শনিবারের চিঠি'র অভিযান ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। কিন্তু সজনীকান্ত সেকথা মানেননি। তিনি দাবি করেছেন যে 'শনিবারের চিঠি'র জেহাদ ছিল ভানের বিরুদ্ধে, ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কণীলেহনের বিরুদ্ধে।

বিরোধীপক্ষের অনেকেই—কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিতকুমার দত্ত, মনীশ ঘটক, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, দীনেশরঞ্জন দাশ—সজনীকান্ত কালক্রমে বন্ধু করে ফেলেছেন। কোন টেকনিকে সজনীকান্ত এই অসাধ্যসাধন করেছেন? কোনও নতুন টেকনিকে নয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে-টেকনিকে বুনো হাতি এবং বন্য ব্যাঘ্রও পোষ মানে, সেই চিরন্তন টেকনিকেই

সজনীকান্ত ওঁদের বশ মানিয়েছেন। কী সেই চিরন্তন টেকনিক? আমি জানি না, চিরন্তন টেকনিক বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা হয়তো বলতে পারবেন।

বিরোধীপক্ষের বুদ্ধদেব বসু চিরকাল সজনীকান্তের বন্ধুত্বের নাগালের বাইরে থেকেছেন। সজনীকান্ত কস্মিনকালেও বুদ্ধদেব বসুকে টলাতে পারেননি।

'কল্লোল' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুই 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে 'বজ্জাতক-কথা' নামক একটি রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি:

"বুদ্ধদেববাবুর কৃতিত্ব আছে স্বীকার করিতে হইবে। তিনি দীর্ঘ পনরো বৎসর ধরিয়া যে সাহিত্যিক জালিয়াতি চালাইয়া সাহিত্যখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, ধরা-না-পড়ার মধ্যেই তাহার কৃতিত্ব! অথচ আসল ও নকল সকলেরই হাতের কাছেই ছিল। এবারে আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। **Aldous Huxley** তাঁহার ***Crome Yellow*** পুস্তকখানা প্রথম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেববাবুর 'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ' ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ওই নভেম্বর মাসেই বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও উপন্যাস, প্রবন্ধ বা গল্প-পুস্তকের নাম দেওয়ার মত মৌলিকতাও যাঁহার নাই, তাঁহার সম্বন্ধে লোকের পূর্ব হইতেই অবহিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন ব্যাপারটা দেখুন।

গল্প

Crome Yellow—Denis কবি, ভালমানুষ। নিমন্ত্রিত অতিথি-রূপে ট্রেনে করিয়া আসিল। পাঠরতা **Priscilla**-র সহিত তাহার দেখা হইল। তারপর চায়ের আয়োজন। বাড়ির মেয়ে **Anne**-কে

Denis ভালবাসে, কিন্তু Anne তাহাকে বন্ধুর পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে এবং treats him as a child। Denis ক্ষুব্ধ। অন্য অতিথি Gombauld quite smart এবং efficient। Denis তাহাকে ঈর্ষা করে। Denis কবিতা লেখে এবং waste-paper-basket-এ ফেলিয়া দেয়। Ivor আসে। রাত্রে উদ্যান-ভ্রমণ, প্রেম। Denis-কে রচনাকার্য্য সম্বন্ধে Mr. Berbecue-Smith এর উপদেশ। Denis এর হতাশ প্রণয়। Mary approached him but nothing doing; Ivor kissed Mary and made love to her. Denis utterly dejected—sent home by Mary. Story ends.

'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ'—সুমিত্রা ট্রেনে করিয়া নীলিমাদের বাড়ি আসিল। পাঠরতা শীলার সহিত তাহার দেখা হইল। চায়ের আয়োজন। পুরন্দর কবি, ভাল মানুষ। নীলিমাকে ভালবাসে। নীলিমা তাহাকে শিশুর মত মনে করে। বীরেন Gombauld ও Ivor-কে পাঞ্চ করিয়া প্রস্তুত—পুরন্দর তাহাকে ঈর্ষা করে। পুরন্দর কবিতা লিখিয়া বাতাসে উড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। রাত্রে সকলের উদ্যান-ভ্রমণ। প্রেম। পুরন্দরকে রচনাকার্য্য সম্বন্ধে ধীরাজের উপদেশ। পুরন্দরের হতাশ প্রণয়। সুমিত্রার 'Overtures' বিফল বীরেন Kissed সুমিত্রা এবং made love to her। পুরন্দর ব্যাকুল। শীলা তাহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিল। গল্পের শেষ।

চরিত্র

Gombauld + Ivor

A good looking black-haired young corsair of thirty, with flashing teeth and luminous large dark eyes. Denis looked at him enviously—envied Gom-

বীরেন

চেহারা ছিল সুন্দর—কালো চুল আর চোখ, সুসম্বদ্ধ দাঁতের সারি···কালো চোখের ঝলসানি। ···পুরন্দর ওকে ঈর্ষা করে ওকে অনুকরণ করে। বীরেন লাফিয়ে

bauld his looks, his vitality, his easy confidence of manner ....Came leaping, laughed as he saw them. He was the hero of more amorous successes than he can remember...irresistible.

গাড়ী থেকে নামে, যার সঙ্গে দেখা হয় আগে হাসে···এক একটি নূতন মেয়ে ওর গৌরবের মালায় এক একটি নূতন মুক্তো···মেয়ে ভুলোনো কৌশল তার আছে।

Crome yellow

Suddenly she [Mary] was caught by an extended arm and brought to an abrupt halt "Well" said Ivor as he tightened his embrace —she made an effect to release herself He laughed ...he kissed her.

'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ'

হঠাৎ তার [সুমিত্রার] দেখা হয়ে গেল বীরেনের সঙ্গে। কোনো কথা না বলে বীরেন তার একটা হাত ধরে ফেললো, তারপর দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখ নিজের মুখের কাছে টেনে আনলো। ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে করতে···। বীরেনের কালো চোখে হাসির আভাস জ্বলে উঠলো।

[তারপর চুম্বন]

He [Denis] felt tremendously large and protective .. She leaned against him... He was the master A wave of courage swelled through him ··"I'll carry you," Denis offered...on the cinema it always looked an easy piece

আমি [পুরন্দর] ওকে [নীলিমাকে] বুঝিয়ে ছাড়ব··· তার অব্যর্থ পৌরুষই সে এবারে প্রয়োগ করবে। দস্তুর মতো হীম্যান হবে সে ··সিনেমায় তো এ-রকম জিনিষ প্রায়ই দেখা যায় ···ঐরকম পাঁজাকোলা করে

of heroism…good heavens, what a weight! …he had to deposit his burden suddenly.

Anne's faint amused, malicious smile ··

তুলে' নিতে পারলেই তো হয়—; …নীলিমা মোটেও ছোটখাটো নয়, মাথায় তো প্রায় তার সমান …নীলিমার কি খেয়াল হয়েছিলো, পুরন্দরের কাঁধের ওপর খানিকক্ষণ মাথা রেখেছিলো…

নীলিমার ঠোঁটের কোণে সেই ক্ষীণ হাসি।

Mr. S. "I'll describe the plot for you. Little Percy, the hero, …lives among the artists……Writes a novel of dazzling brilliance; he dabbles delicately in Amour …Denis blushed scarlet.

নটরাজ। 'তোমার একখানা উপন্যাস আমি পড়েছি…একদল প্রেমিক-প্রেমিকার কথা লিখেছো, …সবাই—সাহিত্যিক না হ'লেও সাহিত্য ঘেঁষা, …পাতার পর পাতা এরা শুধু কথাই কইলো …আমার অবিশ্যি মনে হয়েছে—কেন এই তর্কাতর্কি? ভালোবাসার উপায় তো একই।

পুরন্দর অনুভব করলো, তার কান গরম হয়ে উঠেছে।

Crome yellow--Chapter VI

Mr. Barbecue-Smith - writer,·· rather fat and complacent · He could not control his interior satisfac-

'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধীরাজপ্রসন্ন মহলানবীশ—লেখক; স্থূলকায়—আত্মপ্রীত, মোটা লোমশ একটা আঙুল… কথা বলিতে বলিতে তিনি



tion · Fat white hands and fingers. While talking he jabbed at Denis with his fingers...

"The secret of writing", he said is inspiration That is my secret,··· I give it you freely...It came quite suddenly ·· I was hypnotized. I lost consciousness··· I pop off. Two or three hours later I wake up again, and find that inspiration has done its work. Thousands of words, comforting, uplifting words lie before me.

[Inspiration-এ রচিত কয়েকটি লেখা পড়িলেন এবং শেষে বলিলেন]

"That last one, is particularly subtle and beautiful, don't you think ?"

পুরন্দরের কাঁধে টোকা দিলেন··· "শোনো, ইন্সপিরেশনই হচ্ছে সমস্ত কবিতার উৎস। ···তোমাকে আমার বলে দিচ্ছি। সিক্রেট আর কিছুই নয়—ইন্সপিরেশন। হঠাৎ এক-এক সময় ইন্সিপিরেশন আসে···আমি যেন অসীম শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আমার চারদিক-কার বস্তুজগৎ লোপ পেয়ে গেছে। ···তখন কাগজ-কলম হাতে নিয়ে টেবিলে বসি—বসেই অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর কী হয় আমি আর জানি নে। মূর্চ্ছা যখন ভাঙে, দেখি, কাগজের ওপর সম্পূর্ণ একটি কবিতা লেখা হয়ে গেছে।"

[ধীরাজপ্রসন্ন "ইন্সপিরেশনে" রচিত একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন]

"আমার কলম থেকেও ও-রকম কোনো কবিতা এর আগে বেরোয়নি। ···এরকম মিল আর কেউ দিয়েছে ?"

এই রকম মিল আর কেহই অবশ্য দিতে পারে নাই এবং এখন আদর্শবাদী "ইন্সপিরেশনে'র লেখাও ইতিপূর্বে বাংলা দেশে আর দেখা

যায় নাই। কিন্তু আসলে ইহা বদ্ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতকযুগের কথা। এই জন্মের মূল বুদ্ধদেব তপস্যাশেষে শান্তিনিকেতন বাস্তুতে আবির্ভূত হইবেন-হইবেন করিতেছেন। এতদিন পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে মারের খেলা আছে; মার Huxley, মার Arlen, মার Lawrence, মার Ressetli, মার Browning—কত মারের নাম করিব? কেহ মনে না করেন, মারের নাম করিয়া আমরা মারামারিতে প্ররোচিত করিতেছি। সেরূপ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। এযুগে ইংরেজকে ভাঙিয়া ও ভাঙাইয়া যে কেহই কিছু করিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন, তিনিই যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক, সুতরাং আমাদের নমস্য। বুদ্ধদেববাবুকেও আমরা নমস্কার জানাইতেছি।

একজন মহিলা Browning-এর "In three days", "Pippa, Passes". "Song"; Rossetti-র "Love-sweetness" "The Blessed Damozel", "Lilith"; Swinburne-এর "Olive", 'The Garden of Proscepine", Thomas Sterge Moore-এর "Variation on Ronsard", "The Gazells"; Shelley-র "Prometheus Unbound", Lines to an Indian air" "To the night" প্রভৃতি কবিতা থেকে পংক্তির পর পংক্তি, Phrase-এর পর Phrase এবং ভাবের পর ভাব উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে বুদ্ধদেব বসু এগুলি থেকে "কখনো", "কাল", "চুল", "প্রেমিকের প্রার্থনা", "প্রেম ও প্রাণ", "এ-ই সব", "সেরিনাড", "কোনো বন্ধুর প্রতি", "রূপকথা", "আমন্ত্রণ—রমাকে". "অপর্ণার শক্র" ইত্যাদি কবিতাগুলি রচনা করেছেন। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "ইহাতেও এবারে আমরা কোনও দোষ দেখিব না। Point Counter Point ও Those Barren Leaves-কে লইয়া বুদ্ধদেববাবু কি ভাবে তাঁহার তিনটি উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার মাল-মসলা তো আমাদের ঘরে সংগৃহীতই আছে—সেগুলি সম্বন্ধেই যখন আমরা সহসা-জাত ঔদার্য্যগুণে নীরব রহিতে পারিলাম, তখন—কবিতা তো সকলেই মারিয়া থাকে! বুদ্ধবেদ বসু

যে বঙ্গজনের জন্য মধুচক্র রচনা করিতেছেন, সেজন্য এবারে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদই দিব।" ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৪৯, পৃ. ১৭৫-৭৬)

শুধু কথায় নয়, কাজেও সজনীকান্ত প্রমাণ করেছেন যে সাহিত্যিকেরা যখন কলম চালায় তখনই তাঁদের দল থাকে, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁরা বন্ধু ও সগোত্র।

'শনিবারের চিঠি'র দীর্ঘকালের কর্মী দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য লিখেছেন :

"কোন কোন দুস্থ সাহিত্যিকের ছেলেমেয়ে প্রায়ই সাহায্যের জন্য আসত। সজনীকান্ত বলতেন, এরা এলে কখনও কার্পণ্য করবেন না। আমি না থাকলেও পাঁচ টাকার কম কাউকে দেবেন না।

"বিস্মিত হতাম। হয়তো প্রার্থীদের বাবা কোনদিন কোথাও দু-একটি কবিতা লিখেছেন। আর 'শনিবারের চিঠি'তেই তাঁর উপর কশাঘাত পড়েছে। এ ছাড়া দুস্থ সাহিত্যিকদের অনেকেই যে সাহায্য পেতেন, তাও জানি।"

বিরোধীপক্ষের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেছেন যে সজনীকান্ত শক্তিধর—লেখনীতে তো বটেই, ব্যক্তিত্বেও।

সজনীকান্ত মারা গেছেন ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ২৮ মাঘ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সজনীকান্তের জন্ম ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৯ ভাদ্র।

সজনীকান্তের মৃত্যুর পর সেদিন বিরোধীপক্ষের শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "মৃত্যুর পরপারে মানুষের আত্মা কোথায় যায়, কোথায় থাকে কিছুই জানি না, শুধু জানি আমাদের কাছে সজনীকান্তের মৃত্যু নেই। যতদিন বাঁচব, আমাদের মনের মাঝে সজনীকান্ত অমর হয়ে থাকবে।"

সজনীকান্তের মৃত্যুর পর সেদিনই বিরোধীপক্ষের প্রবোধকুমার সান্যাল লিখেছেন : "লেখকদের সামাজিক জীবনে যে বন্ধুগোষ্ঠী থাকে সেই গোষ্ঠীর একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সজনীকান্ত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর মত এত বড় বিতর্কজাল আর কেউ সৃষ্টি

করেননি। তাঁর মৃত্যুতে আমার মতন অনেকেই একজন বন্ধুবৎসল মানুষ হারালেন।"

বিরোধীপক্ষের পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জীবনে অনেক বন্ধু পেয়েছেন ; কিন্তু, সজনীকান্তের মৃত্যুর পর সেদিনই তিনি বলেছেন, সজনীকান্তের মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের বিষয়। এবং তারপর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "সজনীকান্তের আমি বহুদিন ছিলাম প্রতিবেশী, দিয়েছি যত পেয়েছি তার বেশী। অন্তরের প্রতিবেশীকে আমি যদি কিছু দিয়ে থাকি তাঁকে, তা নিছকই বস্তুসত্তাবিহীন আন্তরিকতার ভাঁওতা। অথচ তিনি তাঁর সেযুগের সমগ্র আক্রমণের লক্ষ্যকেন্দ্র কল্লোলের এই ব্ল্যাকশীপটিকে কতভাবে যে সাহায্য করেছেন, আজ তা ভাবতেও আমি বিহ্বল হয়ে পড়ছি। শুধু সাহিত্যের আদর্শে নয়, রাজনৈতিক বিশ্বাসেও আমাদের পার্থক্য ছিল মেরুবৎ; কিন্তু কোনদিন সেদিক দিয়ে আমাদের সৌহার্দ্যে চিড় ধরেনি, বরং রাজনীতি যাতে আমাদের মধ্যে কোনরকম বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে তাঁকে সদাসচেতন থাকতে দেখেছি।"

বিরোধীপক্ষের প্রেমেন্দ্র মিত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ৩০ মাঘ, লিখেছেন : "সমালোচক সজনী আর বন্ধু সজনী যেন দুই আলাদা মানুষ। তার বন্ধুত্বে ভেজাল ছিল না। সে বন্ধুত্বের উত্তাপ যারা পেয়েছে তাদের কাছে সজনীর চলে যাওয়া একটা অপূরণীয় ক্ষতি।"

'শনিবারের চিঠি'র মধ্যে 'সংবাদ-সাহিত্য' নামে একটি চিত্তাকর্ষক বিভাগ ছিল। মাসের পর মাস (দু-এক মাস বাদ পড়েছে বটে, কিন্তু সেটুকু ধর্তব্যের মধ্যে নয়), বছরের পর বছর সজনীকান্ত প্রধানত বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে 'সংবাদ-সাহিত্যে'র পৃষ্ঠা ভর্তি করেছেন। পরিমল গোস্বামী লিখেছেন : "রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তার নিচে মন্তব্য জুড়ে দেওয়া প্রধানত সজনীবাবুর সময় থেকে আরম্ভ হয়। এবং সব সময় তা যে অসৎ সাহিত্য থেকেই নেওয়া হত তা নয়। বিশুদ্ধ কৌতুক সৃষ্টির জন্য অনেক রচনাংশ নেওয়া হত, তা নিয়ে সরস

মন্তব্য লেখার সুবিধা হত বলেই। এই জাতীয় টিপ্পনি লেখায় সজনীকান্ত পুরো ওস্তাদ ছিলেন। আবার ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য এবং আক্রমণে ধরাশায়ী করার জন্য যে সব হাঁড়ির খবর জানা দরকার, তা সজনীকান্ত কি কৌশলে সংগ্রহ করতেন জানি না।"

সজনীকান্ত গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানারকম রচনা লিখেছেন। কিন্তু সাধারণের দরবারে 'সংবাদ-সাহিত্যে'র লেখক সজনীকান্তকে সম্ভবত অন্য কোনও সজনীকান্ত অতিক্রম করতে

'সংবাদ-সাহিত্য' থেকে কয়েকটি নমুনা দাখিল করি।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'প্রগতি' থেকে একটুখানি: "কোন গল্পে কে ক'চুমুক হুইস্কি খেল, বা ক'বার মোটরের টায়ার ফাটল, এই সব তুচ্ছ জিনিষ নিয়েই আমরা সাধারণতঃ এত বেশি মশগুল হয়ে পড়ি যে, গল্পটি সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে সার্থক হয়েছে কিনা, তা বিচার করবার আর অবকাশ পাই না—"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "কি মুস্কিল! শিরো নাস্তি শিরো ব্যথা। যে লেখার সর্ব্বস্বই কয়েক চুমুক হুইস্কি ও বারকতক টায়ার ফাটার শব্দ তাহাকে লইয়া আর কি করা যায় বলুন ত! কালির বোতলের মধ্যে হিমালয় কোথায় পাইব?" ('শনিবারের চিঠি', পৌষ, ১৩৩৪, পৃ. ৩৭০)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের 'প্রগতি'তে 'আশাতীত ফললাভ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি:

"রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও কেহ কোনদিন তাঁহার Imagination-এর বড়াই করে না। কিন্তু তাঁহার emotion সম্বন্ধেও আজকাল এমন একটা অস্ফুট কানাঘুষা শোনা যায়, যাহাতে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের emotion-এর বৈচিত্র্য থাকিলেও তাহাতে যে খুব বেশী intensity নাই সেকথা লোকে বুঝিতেছে। কাব্যে যদি imagination না থাকিল, intensityও না থাকিল, থাকিল কি? রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলিবেন,

রূপ। কিন্তু একদিকে তাঁর সমস্ত রূপ আর একদিকে 'মরীচিকা'র কবি যতীন্দ্রনাথের এই কয়টি লাইন—

'চেরাপুঞ্জীর থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার
গোবি সাহারার বুকে?'

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রূপ খুঁজিয়া কি এই তিনটি লাইনের অদ্ভুত কল্পনাশক্তিতে যে **pure poetic pleasure** রহিয়াছে তাহা কোথায়ও পাইব। কোথায় বা চেরাপুঞ্জীর পাহাড়, আর কোথায় বা আকাশের মেঘ, আর কোথায়ই বা গোবি সাহারার শুষ্ক ধূসর বুক। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তি কোন দিনই এমন তিনটি বিরাট সুদূর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে একটি ভাবের অভিব্যক্তিতে একত্রিত করিতে পারে নাই। **Divine inspiration** বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা এই তিনটি লাইনেই ধরা পড়িয়াছে। ইহার পাশে "রূপহীন মরণের মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে" প্রভৃতি লাইনও শুধু কথার কারসাজি বলিয়া মনে হয়।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "তাইত? অদ্ভুত। "কোথায় বা" ইত্যাদি—আমাদের বন্ধু উত্তমাশা এরকম একটা কবিতা লিখিয়াছিল, কবিতাটি শুনিয়া হাসিয়াছিলাম—তখন **intensity** আর **imagination** এর কথা জানিতাম না, জানিলে আমাদের অংশুরীপকে কোলে লইয়া নাচিতাম। এই কবিতার কাছে যতীনবাবুর কবিতাটি অপোগণ্ড শিশু—একেবারে বালক। কবিতাটি মনে আসিতেছে না—কিন্তু ভাবটা মনে আছে। যতটুকু মনে আছে তাহার মধ্যেই **intensity** ও **imagination** এর বহর দেখুন—"নিমাইদের বাছুরটা যেই মঙ্গলা গাইয়ের বাঁটে মুখ দিল অমনি জননী কুন্তীর স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল, কুমারী মেরীর বক্ষস্থল চুলকাইতে লাগিল, কনফুসিয়াস কাঁদিয়া উঠিলেন, এরিষ্টটল বলিলেন—'থাম থাম'। কিন্তু বিরহিনী রাধিকার রোদনের অন্ত নাই—দুধ হইতেই ননী, দুধ হইতেই

দধি, বাছুরেই যদি খাইয়া ফেলিল, গোপাল খাইবে কি ?" কোথায় বাগবাজারের নিমাই বাঁড়ুয্যের বাছুর আর কোথায় বা কুন্তী, কোথায় বা মেরী, কোথায় কনফুসিয়াস, কোথায় এরিষ্টটল, সর্ব্বোপরি কোথায় বা বিরহিনী রাধা ! ব্যাকুলা রাধার গোপালের লাগিয়া ক্রন্দনের মধ্যে যে intensity তাহার কি তুলনা আছে ?" ('শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ, ১৩৩৫, পৃ. ৪৩৯-৪০)।

রেবা রায়, 'আত্মশক্তি'র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায়, লিখেছেন : "আমার বাবার সম্পূর্ণ মত ও সহানুভূতি পেয়ে আমিও নিন্দার ভয় না করে এর পর থেকে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা যতদূর সম্ভব নৃত্য করেছি ও করাইয়াছি।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : "নাচ অতি রমণীয় জিনিষ, নাচানো ততোধিক রমণীয়। ইহার উপর যখন 'আমার বাবার সম্পূর্ণ মত' আছে, তখন কাহারও বাবার কিছু বলিবার থাকিতে পারে না" ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৩৫, পৃ ৮১৬)

সেকালের বড়-বড় মাসিকপত্রিকাগুলি সম্পর্কে সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : "এ যেন সেই সওয়া আটআনা পয়সায় থিয়েটার, রাত্রি-বাস, গঙ্গাস্নান, আবার সেই সঙ্গে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ! হিসাবটা বোধ হয় সকলে বুঝিলেন না ? তখনকার দিনে আট আনাতেই থিয়েটারের গ্যালারীতে সারারাত্রির আশ্রয় এবং আমোদ ; তারপর সকালে বাহির হইয়া এক পয়সার ফুলুরীগুলি নিংড়াইয়া সেই তেলটুকু মাথায় গায়ে মাখিয়া গঙ্গায় গোটাকয়েক ডুব, তারপর স্নানশেষে সেই ফুলরীতেই জলযোগ সম্পন্ন করিয়া যেখানে খুসী যাও ! আমাদের বড় বড় মাসিকপত্রগুলিতেও তেমনি সস্তায় অনেক কিছুর ব্যবস্থা করা হয় -খদ্দেরের ভিড়ও তেমনি !" ('শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন, ১৩৩৫, পৃ ১০৮-০৯)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'টলষ্টয় ও তাঁহার স্ত্রী আঁদ্রিভ্না' নামক একটি প্রবন্ধে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন :

"টলষ্টয়ের স্ত্রী স্বামীকে চোদ্দটি সন্তান উপহার দিয়েছিলেন।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "পংক্তি পড়িলেই মনে হয় যেন টলষ্টয় বেচারীর ইহাতে কোনও হাত ছিল না।" ('শনিবারের চিঠি'র, ফাল্গুন, ১৩৩৫, পৃ. ১৩০)

এই প্রবন্ধেই অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন: "তাই সে স্বামীর পায়ের সঙ্গে পা মেলাতে পারলে না।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "হাতের সঙ্গে হাতটা বোধ হয় বিবাহের সময় মিলাইয়াছিল, কিন্তু পায়ের সঙ্গে পা মেলানো হয় নাই জুতার জন্য! কিন্তু চৌদ্দটি সন্তান!" ('শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন, ১৩৩৫, পৃ. ১১১)

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'মাসিক বসুমতী'তে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সমালোচনা করেছেন—নরেন্দ্র দেব অনূদিত মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র সমালোচনা।

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন:

"সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে আমরা এতকাল উকীল বলিয়াই জানিতাম। আষাঢ়ের মাসিক বসুমতীতে হঠাৎ দেখি তিনি কাব্য-সমালোচক হইয়াছেন। কেমন খটকা লাগিল। জজের রায় দেওয়ার ভঙ্গীতে লেখা হইলেও ওকালতীই বটে—নরেন্দ্র দেবের। ফী-এর খবর জানি না। মকোদ্দমা কবি কালিদাস ও কবি নরেন্দ্র দেবে। সৌরীনবাবু কৌশলে নরেন্দ্র দেবের ওকালতী করিয়াছেন। যথা—

> কালিদাসের মেঘদূত আগাগোড়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। নরেন্দ্র দেব একই ছন্দে অনুবাদ করেন নাই। তিনি বহু বিচিত্র ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন—যেখানে যে ছন্দ মানায়, সেখানে তেমনি ছন্দ! ইহাতে তাঁর বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাই প্রচুর।

বেচারা কালিদাস। সেই একঘেয়ে ছন্দই তোমার কাল হইল।" ('শনিবারের চিঠি', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ৬৫৩-৫৪)

সমালোচার শেষাংশে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন: "দুর্দ্দিনের বহু বেদনা, সংসারের অভাব-অভিযোগের বহু যাতনা, এ বই পড়িয়া, এ বই দেখিয়া বাঙালী অনেকখানি ভুলিতে পারিবেন, একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: আমরা বলি, আসাম বন্যার জন্য এত টাকাকড়ি, ধানচাল, কাপড়চোপড় না পাঠাইয়া হাজারখানেক কপি 'মেঘদূত' কিনিয়া বন্যাপীড়িত অঞ্চলে প্রেরণ করিলে হয় না? কমিশনটা না হয় সৌরীনবাবুই লইবেন!" ('শনিবারের চিঠি', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ৬৫৪)

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল 'রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মসম্পদ' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে লালিত ও বর্দ্ধিত।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: 'উপনিষদের স্তন!" ('শনিবারের চিঠি', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ৬৫৫)

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত 'মেঘমল্লার'-এর সমালোচনা, প্রসঙ্গে, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'পরিচয়ে', পশুপতি ভট্টাচার্য লিখেছেন: "উঁচুদরের গল্প লেখার যে প্রতিভা—যা আমাদের দেশে দুর্লভ—এই বইখানির মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া গেল। উৎসর্গ থেকে জানা যায়,—শরৎবাবু লেখকের মামা। তাঁর ভাষাসম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে হয়তো ইনি পেয়ে থাকবেন—"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "দৈবদুর্বিপাকে বিভূতিবাবুর এক মাতুলের নাম শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এই মাতুলকেই তিনি গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচ-কের সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে গেল, তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না যে, বিভূতিবাবু

এই অপরূপ ভাষা ও লিখনভঙ্গী কাহারও ভাগিনেয় বা পুত্র না হইয়া কেমন করিয়া পাইতে পারেন। যেমন উৎসর্গপত্র দেখা অমনিই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। পরিচয়েরও চূড়ান্ত হইল। একটা কথা—পশুপতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোন মাতুলের নাম কি ম্যাথু আর্নল্ড? নহিলে এই অপরূপ সমালোচনাশক্তি তিনি পাইলেন কোথা হইতে?" ('শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮, পৃ. ৫২-৫)

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ফাল্গুনের 'স্বদেশে' প্রকাশিত একটি গল্পে প্রবোধ কুমার সান্যাল লিখেছেন :

> সুখলতা কহিল, 'মেয়েদের সঙ্গে শুতে আমার ভাল লাগত না। পুরুষ মানুষের সঙ্গে থাকার একটি বিশেষ আনন্দ মেয়েরা পায়।' তারপর হঠাৎ রুক্ষকণ্ঠে সে কহিল, 'তুমি এই নিয়ে তিনবার বললে যে আমি সতী সেজে বসি, তার মানে?'
>
> 'মানে তুমি চলতি ভাষার সতী নও।'
>
> 'হওয়া উচিতও নয়! আমি বরং অসতী হতে রাজি আছি কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর সতীত্বকে পাহারা দিয়ে দিনরাত লুকিয়ে থাকতে রাজি নই।'
>
> তাহার স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ কথাগুলা সমস্ত ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : 'এইখানে সান্যাল মহাশয়ের একটু ভ্রম হইয়াছে। লেখা উচিত ছিল—"তাহার স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ কথাগুলা সমস্ত ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে একেবারে রাজা রাম-মোহন রায়ের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া কহিল, 'বাবা, সতীদাহ প্রথা রদ করাইলে কেন?'" ('শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন, ১৩৩৮, পৃ. ৭৭৫-৭৬)

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'সাহিত্য সৃষ্টি'

নামক প্রবন্ধে বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখেছেন : "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে যেন বিশাল পরিধি মধ্যে তলাইয়া যাইতে হয় ; ধরিবার মত কোন আশ্রয় অবলম্বন নাই, অতল, অপার, বিপুল ! কি অবলম্বন করিয়া আরম্ভ করিব ? কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, সঙ্গীতে, আবৃত্তি, অভিনয়ে এবং চিত্রশিল্পে এই সপ্তবিধ ললিত কলা..."

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"এ যে দেখিতেছি গভীর প্রেমের কথা ! 'সকলকেই দেখছি কিন্তু কাউকে দেখছিনে কেন' গোছ ভাব !

সপ্তবিধ ললিত কলা কি কি পাঠক শিখিলেন কি ? ইতিহাসে, ভূগোলে, খগোলে, জ্যামিতিতে, ত্রিকোণমিতিতে—এই করিয়া ৬৪ ললিত কলা পূর্ণ করিয়া দিলেই হইত !" ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র, ১৩৩৮, পৃ. ১০৩-০৪)

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র সমালোচনা করেছেন। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : "কোষ্ঠীপত্রের দ্বারা চারুবাবু প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন অমিট রায়ে রবীন্দ্রনাথেরই বেনামী, কারণ অমিট রায়ের জন্মলগ্নে চাঁদ এবং যাঁরা চারুবাবুর মত 'রবিঠাকুরের কোষ্ঠীর খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে তাঁর জন্মলগ্নে আছে চাঁদ'—'অমিতর বেনামী কথা' তাঁর নিজের কথা...'নিবারণ চক্রবর্ত্তীর বেনামী স্বয়ং রবিঠাকুরই' কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। আশ্চর্য্য, অমরা ভাবিয়াছিলাম, কবিতাগুলি ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের লেখা।..." ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯, পৃ. ৩১১)

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৭ আষাঢ়, একখানা চিঠি লিখেছেন 'বিচিত্রা'র সম্পাদককে। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি : "রবীন্দ্রনাথ কি যে-কোন ঋষির চেয়ে কম নাকি ? বরঞ্চ শুধু ঋষি বললেই তো তাঁকে খাট করা হয়। আমি তো মনে করি

সংস্কৃত সাহিত্যে যারা আর্ষ প্রয়োগ করে গেছেন, এমন যে-কোন ঋষি রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলায় বসবার সৌভাগ্য লাভ করলে কৃতার্থ হয়ে যেতেন।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "আলবৎ। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলায় বসিবারও যোগ্য নন। এ প্রশস্তিখানি কবির নিকট পাঠাইলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বিচিত্রার উপর খুসী হইয়া "আফগানিস্থানের প্রস্তাবিত যাত্রা"র ইতিহাসটিও পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে বিচিত্রাকে দান করিবেন।·· আমরা অতঃপর রবীন্দ্রনাথকে "শুধ্ ঋষি" না বলিয়া "বৃদ্ধর্ষি" বলিয়া উল্লেখ করিব।" ('শনিবারের চিঠি', আষাঢ়, ১৩৩৯, পৃ· ৩৯৪)

সন্ন্যাসী সাধুখাঁ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের 'প্রবাহ' পত্রিকায়, 'ইন্দুলেখা' নামে একটি গল্প লিখেছেন। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "লেখক একসঙ্গে সন্ন্যাসী, সাধু এবং খাঁ ('বাহাদুর' নাই)। গল্পটি পড়িয়া সন্দেহ করিবার অবকাশই থাকে না যে লেখক সন্ন্যাসী—সাধু কি না বলা শক্ত।"

গল্পে আছে, ইন্দুলেখা বিছানায় শুয়ে আছে। তার "পরণে রক্তের মতো টকটকে লাল শাড়ী, গায়ে ঐ রঙেরই ব্লাউজ। এতে বোঝা যাচ্ছে ও কাপড় না ছেড়েই শুয়েছে।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "লেখক যে সন্ন্যাসী উপরোক্ত মন্তব্যই তাহার প্রমাণ; সন্ন্যাসীর চাইতে কম সংযম লেখকের থাকিলে ইন্দুলেখা কাপড় ছাড়িয়াই শুইত।"

'ইন্দুলেখা' থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করি: "বিয়ের প্রয়োজন আছে ও (ইন্দুলেখা) জানে—কিন্তু সে প্রয়োজন তো এখনো ওর আসেনি। তবে তাছাড়া যাকে ও জানে না শোনে না তাকে ও কি করে বিয়ে করে? বিয়ের আগে ও যাচাই করে নেওয়ার পক্ষপাতী—মনের দিক দিয়ে তো বটেই, দেহের দিক দিয়েও। মিলন যখন সবদিক

দিয়েই হবে তখন সবদিক দিয়ে খাপ খাবে কিনা আগে থাকতে জানা ভালো। তা ছাড়া ওটা স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"এখানে কিন্তু ঠিক সন্ন্যাসীর কথার মত শুনাইতেছে না, দেহের সবদিক—পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ অধঃ—এ সবের খবর সন্ন্যাসীর রাখার কথা নয়, তা ছাড়া খাপ খাওয়া—বাবাজী নিশ্চয়ই র‍্যাঙ্কিনের বাড়ীর স্যুট পরেন না, আলখাল্লাই পরিয়া থাকেন, খাপাখাপির হিসাব তিনি করিবেন কেমন করিয়া? প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়, খাঁ সাহেব কয় পুরুষে সন্ন্যাসী?

'স্বাস্থ্যের পক্ষে ওটা অনুকূল'—ওটা কি?" ('শনিবারের চিঠি', ভাদ্র, ১৩৩৯, পৃ. ৬৯৬-৯৮)

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়েছে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৯ পৌষ; প্রথম দিনের উৎসব-অপরাহ্নে টাউনহলে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেছেন, শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রজয়ন্তীর শেষ অনুষ্ঠান হয়েছে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২০ পৌষ।

শরৎচন্দ্রের ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্তি উপলক্ষে শরৎ-বন্দনা হয়েছে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২ আশ্বিন। এই শরৎ-বন্দনা হওয়ার কথা ছিল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩১ ভাদ্র, অনিবার্য কারণে সেদিন হয়নি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনার ফলে তিনি উনুপস্থিত থেকেছেন।

শরৎচন্দ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২ আশ্বিন, একটি ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

"সংসারে সৌন্দর্য্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতি-যূথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন। কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু, অন্তরে যাকে পাই নি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি ব'লে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করি নি।"

শরৎচন্দ্র এই 'শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গাঁথা'র শব্দভেদী বাণ কার উদ্দেশে নিক্ষেপ করেছেন ?

শরৎ-বন্দনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একখানা আশীর্বাদীপত্র পাঠিয়েছেন শরৎচন্দ্রকে। সেই আশীর্বাদীপত্রের সূত্রে সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"কথায় বলে, শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি ; শরৎ-বন্দনা উপলক্ষ্যে তাহাও আমরা দেখিলাম, দেখিয়া দেহমন পবিত্র করিলাম। সেয়ান শরৎচন্দ্র 'শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গাঁথার' শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিরা যে কায়দা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, তদধিক সেয়ান রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাদী পত্রে তার তুলনায় অল্প কায়দা দেখান নাই— শব্দব্রহ্মের নিকুচি করিয়া ছাড়িয়াছেন। পত্রখানির স্থূল মর্ম্ম এই ;— আমার জয়জয়ন্তীর দেখাদেখি তোমার এ ক্ষ্যাপামি কেন ? তুমি ত বাপু এখনও তেমন কিছু কর নাই, যাহা করিয়াছ তাহাতে দেশবাসীর নিকট এ ধরণের সম্বর্দ্ধনা আদায় করিতে যাওয়া হাস্যকর! আমার সমান হইতে এখনও ঢের দেরী। এখনই তোমার হইয়াছে কি ?— যাটের কোঠায় পা দিয়াছ বই ত নয়! নিতান্তই ছেলেমানুষ! এই ত মোটে আরম্ভ, এখনও ঢের লেখা লিখিলে তবে আমার পাছ ধরিতে পারিবে। 'লিখে যাও, লিখে যাও! দেখ পারো কিনা।' রবীন্দ্রনাথের মত, এমন অমায়িক ভাবে এত বড় রসিকতা আর কেহ করিতে জানে ? সে রসিকতার ভাষা কি সূক্ষ্ম, কি সুমার্জ্জিত! স্থূল মর্ম্ম উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি—সূক্ষ্ম ভাষার নমুনাও দিলাম।

'তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া

আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করছে।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়। এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। * * * * সবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজনহস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সে দিন বহুদূরে থাক। * * * * জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় নিশ্চিত মনে রেখো।'

কথাগুলি কি শোভন সুন্দর, কি সুমিষ্ট! সখি! এমন না হইলে লোকে তোমাকে প্রিয়ম্বদা বলিবে কেন?" ('শনিবারের চিঠি', আশ্বিন, ১৩৩৯, পৃ. ১৯৪-৯৫)

বুদ্ধদেব বসুর 'মধ্যস্থ' নামে একটি গল্পের ভাষার সূত্রে সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন:

"বুদ্ধদেবের হাত খুলিয়াছে। ইহার পর আর কেহ বলিতে পারিবেন না যে বুদ্ধদেব বাংলা লিখিতে জানেন না। গল্পের নাম 'মধ্যস্থ'—ভাষার নমুনা—

> 'I'll see that you do' ভোলা তার প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো।
>
> 'Why can't you leave me alone?'
>
> 'Why should I? It's my duty to make you feel your position'—
>
> 'Fire away. I'm not afraid of you.'

ইংরেজিতে শুধু এই কথাটাই বলিতে ইচ্ছা হয় যে বাংলা ভাল।" ('শনিবারের চিঠি', মাঘ, ১৩৩৯, পৃ. ৬৬২-৬৩)

শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায়কে সজনীকান্ত

বহুবার ছাপার অক্ষরে 'পাগলা জগাই' বলেছেন। 'দোলা' নামে দিলীপকুমারের একটি রচনার সূত্রে সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"পাগলা জগাই কিন্তু বাংলা ভাষায় বুদ্ধদেবকেও ছাড়াইয়া গেল। গল্পের নাম 'দোলা'—ভাষার নমুনা—

* * *

Que vous etes indiscret mon cher ?

লক্ষ্মীটি—'মনামি'।

'মনামি'কে কেহ চৈনিক 'নমামি' বলিয়া ভুল করিবেন না।

এইটুকু গেল বাংলা অংশ। ইহার পর ফরাসী কিছু কিছু আছে—

স্বপন বিরস সুরে বলে : নিজেদের ব্যবহারের খোঁচাকে মেয়েদের অমনি চুলের পাঁপড়ির মতন নরমই মনে হয় বটে।

চুলের পাঁপড়ি, বালাপোষের, ফুল, কম্বলের পর্ণপুট, গোঁফের সৌরভ, ঘোড়ার লেজের কুঁড়ি ; এই রকম বারোটি কথা সংগ্রহ করিতে পারিলেই শ্রীঅরবিন্দের কাছে লিখিব--

শিষ্য মোক্ষলাভ করিয়াছে, এইবার সমুদ্রে ছাড়িতে পারেন।" ('শনিবারের চিঠি,' মাঘ, ১৩৩৯, পৃ. ৬৬৩-৬৪)

'স্বদেশে' প্রকাশিত সন্ন্যাসী সাধুখাঁর একটি কবিতায়, সজনীকান্তের মতে, একটি মাত্র অস্পষ্ট কথা আছে। কবিতাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

"—সে আজি আসিয়াছিল।
সেই তন্বী ঋজু-দেহা ; নামটি সুষমা। সেই মোর
একান্ত আপন ; (আজ কিন্তু অর্দ্ধ পরিচিতা !)"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : "কোন অর্দ্ধ ?" ('শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ, ১৩৪০, পৃ. ৪৮০)

একজন অধ্যাপক-কবি লিখেছেন :

"বসনে গোপন বক্ষ-কমল—
কুয়াশায় ঢাকা নলিনী



UTTARAYAN
SANTINIKETAN BENGAL.

২৮।৫।৪১

কল্যাণীয়েষু,

সজনী, গল্পগুলো তোমার ভালো লেগেছে শুনে আমি খুশী হলুম। ও রকম খুচরো গল্প সাধারণ লোকের কানে পৌঁছয় না, কিন্তু পাশকাটিয়ে চলে যায়। তুমি যে তার ঠিক সুরটি ধরতে পেরেছ এতে তোমাকে সাহিত্য সমজদার বলে চেনা গেল।

তোমার শরীর অসুস্থ এর মধ্যে তুমি যে এই লেখায় মন দিতে পেরেছ এ খুব আশ্চর্যের বিষয়। তুমি দুর্যোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করো, আমি এই কামনা করি। ইতি

আশীর্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তারও আহ্বানে কেঁপে ওঠে বুক
সে যে ছুনয়ন মোহিনী।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "অধ্যাপক হওয়ার এই বিপদ। কেবল কাঁপিতে হয়। ছাত্রাবস্থায় যে সব সিচুয়েশনে আনন্দ দেয়—অধ্যাপক অবস্থায় তাহাই কাঁপাইতে থাকে। ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই?" ('শনিবারের চিঠি,' ভাদ্র, ১৩৪১, পৃ. ১৩৮৪-৮৫)

নানারকম নামের আড়ালে একদা 'প্রবাসী'তে বিস্তর স্তনের ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'লঙ্কাদহন কালে' নামে একখানা ছবির সূত্রে সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "স্তন-কলা ওস্তাদগণ কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছে না। এই 'কলা' নানা নামে প্রকাশিত হইতেছে। নাম না থাকিলে ইহার কোনো মূল্যই নাই, ওস্তাদেরা তাহা জানে। বৈশাখের প্রবাসীতে "লঙ্কাদহন কালে" এই নামের আশ্রয়ে এবারে শুধু স্তন নহে অধস্তন অংশও অঙ্কিত হইয়াছে। লঙ্কা দহন বাজে কথা। চারিদিকে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা মেঘও হইতে পারে, আগুনও হইতে পারে, জলও হইতে পারে। কিছু যায় আসে না। স্তন থাকিলেই আমরা ধন্য।" ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র, ১৩৪১, পৃ ৭৪৭)

১৩৪২ বঙ্গাব্দের পৌষের 'প্রবাসী'তে রমাপ্রসাদ চন্দ 'রাজারাম রায়' নামক একটি রচনায় লিখেছেন: "বেদান্তে পারদর্শী অধ্যাপক না থাকায় অনুবাদ-কার্য্যে রামমোহন রায়কে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। উপনিষদ সকলের অনুবাদেও তাঁহাকে সেইরূপ পরিশ্রমই করিতে হইয়াছিল। তিনি এই প্রকার বহু শ্রমসাধ্য শাস্ত্রচর্চ্চায় এবং তৎকালে অভাবনীয় ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহার পক্ষে প্রণয়িনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া বা শৈব বিবাহ কতটা সম্ভব, তাহা নিরপেক্ষ সুধীজনের বিবেচ্য।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "রমাপ্রসাদ বাবুর মতে (এবং

আমাদের মতে) ঠিক এই সময়টায় ইহা সম্ভব নহে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে প্রণয় চর্চ্চা করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু গুরুতর কাজ হাতে থাকা কালীন করা যায় না। ...যাহারা ব্যবসা করে, প্রণয় চর্চা করিবার সময় তাহারা ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেয়; যাহারা চাকরি করে, তাহারা চাকরি ছাড়িয়া দেয় কিংবা sick report করে। প্রণয় জিনিসটি যতটা সহজ মনে করা যায় ঠিক ততটা সহজ নহে।" ('শনিবারের চিঠি', মাঘ, ১৩৪২, পৃ. ৪৯৩)

শরৎচন্দ্রের ভক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' পত্রিকায়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১৪ চৈত্র, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্রকে ডাক্তার উপাধি দিবেন এ সংবাদ শ্রবণ করিবা মাত্র শরৎচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাইত. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতলব কি? আমার সহিত ইয়ার্কি করিতেছে না ত! ডাক্তার হইব কেন? লিখিলাম খানকত গল্পের বই, অথচ ডাক্তার! ডাক্তার মানে কি? শরৎচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মাথা ঘুরিয়া ভূমিতে লুটাইলেন। এ বিপদ হইতে তাঁহাকে কে উদ্ধার করিবে? পৃথিবীতে এমন বন্ধু কে আছে? একবেলা পড়িয়া থাকিবার পর হঠাৎ মনে পড়িল "ঠিক বটে, ঠিক",—অবিনাশ ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করিলেই ত হয়! সে 'প্রাকৃতিক' ভাষা জানে, এবং বাংলা ভাষার বংশপরিচয় তাহার কণ্ঠস্থ। এই ত সেদিন কাজি নজরুলকে বলিয়াছে তাহার বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার নাই, কারণ "সংস্কৃতই যে বাংলা ভাষার জননী" একথা কাজী জানে না। অবিনাশ জানে।

সুতরাং শরৎচন্দ্র এই অবিনাশকেই ডাকিলেন এবং ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা অবিনাশ, ঢাকার মতলবটা কি? দুই চারিটি নার্কোটিক ছাড়া ত আর কোনো ঔষধের নাম জানি না, তবে ডাক্তার উপাধি দিতে চায় কেন? ডাক্তার মানে কি? মতলব খারাপ নয় তো? মাইরী, এ যে ঘোর বিপদ!

অবিনাশ বলিল, ডাক্তার মানে জানি না, তবে আমি বলিতেছি, আপনার কোনো ক্ষতি হইবে না। ভাবিয়া দেখিবেন, আমি বলিতেছি। আমি কি না বলি? বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি উহাকে ভিত্তি করিয়া যদি আপনি একটা প্রবন্ধ ঢাকায় পড়িয়া আসেন তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও চুপ করিয়া থাকিবে না— অন্তত কবিরাজ-জাতীয় একটা উপাধি দিবেই। আমার বিদ্যার বহর দেখিয়া আপনি আমাকেই যে আপনার পরামর্শদাতারূপে বাংলাদেশের ভিতর হইতে বাছিয়া লইয়াছেন ইহাতে আপনার বিদ্যার বহরও সকলেই দেখিতে পাইবে—কুছ পরোয়া নেহি—উপাধি ছাড়িবেন না—Be courageous, boy, বলিয়া অবিনাশ শরৎচন্দ্রের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া সোজা বাতায়ন অফিসে আসিল—এবং সেখানে বসিয়া লিখিল—

শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট উপাধি প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের অনুরোধ পত্র

"উপাধি গ্রহণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় ধন্য হইবে"

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডি, লিট উপাধি প্রদান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করবার সংবাদ ইতিপূর্বেই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শরৎচন্দ্রকে অনুনয় বিনয় করে [প্রায় পা জড়াইয়া ধরিয়া!] জানিয়েছেন তিনি যেন এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ না করেন। তিনি আরো বলেছেন, এই উপাধি তাঁর কোন গৌরব বাড়াবে না কিন্তু তা গ্রহণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে ধন্য মনে করবে। পত্রখানি পেয়ে শরৎচন্দ্র বড় বিব্রত হয়ে পড়েন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উপাধি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে কি না, এ সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। এই সন্দেহ দূর করবার জন্যে তিনি শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে এ সম্বন্ধে তাদের মতামত জানাতে বলেন।

এর মধ্যে যে দোষের কিছুই নেই নানা যুক্তির দ্বারা এই কথাটা যখন তিনি উপলব্ধি করলেন তখন তা গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর আর কোন আপত্তি রইল না। আগামী এপ্রিল মাসে এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কনভোকেশন হবে শরৎচন্দ্র তখন সশরীরে উপস্থিত থাকবেন, এমনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" ('বাতায়ন,' ১৪ চৈত্র ১৩৪২)

শেষ কয়েক লাইনে অবশ্য লেখক এই কথাটি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে ঢাকা এপ্রিল মাসে স্বর্গে পরিণত হইবে এবং শরৎচন্দ্র সেখানে সশরীরে যাইবার মত পুণ্য অর্জন করিবেন। বোধ হয় ইহা দ্বারা এপ্রিলের ঝড়ে পদ্মায় ষ্টীমার ডুবির ইঙ্গিত করা হইয়াছে।" ('শনিবারের চিঠি', বৈশাখ, ১৩৪৩, পৃ. ৮৭৪-৭৬)

কে বা কারা কোথায় কবে যেন বলেছেন বা লিখেছেন যে চলচ্চিত্র-শিল্পে ভদ্রমহিলার আবির্ভাব নীতি-অনুমোদিত নয়। সম্পাদকীয় অনুসন্ধানের পর 'বর্তমান' লিখেছে: "এ অভিপ্রায়ে কিছুদিন ষ্টুডিওর ভেতর ঘুরে দেখলাম সত্য উপলব্ধির জ্বলন্ত নিগূঢ়তার জন্য।...দেখলাম সেখানে উচ্ছন্নের বিসর্পিলতা কিছু নেই, যা আছে তা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধতায় পবিত্র।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন:

"নিশ্চয়ই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় ইনি কাদের তরফের। ষ্টুডিও-মালিকরা প্রত্যহ এরূপ কতজনকে পবিত্র স্নিগ্ধ পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পান করিতে দেন? অমাবস্যার সময় কি ষ্টুডিওর কাজ বন্ধ থাকে?

কিন্তু এই Enthusiastটি এখানেই থামেন নাই। ষ্টুডিও ভাবিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার ঘরের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। তিনি ক্ষেপিয়া গিয়া বলিতেছেন—

> তার চেয়ে অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে সমাজের অন্তঃস্রোতের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে অসূর্য্যম্পষ্যা (sic) গোষ্টিতে (sic গুষ্টি?) ব্যভিচারের বন্যা প্রবাহিত হয়ে

থাকাই অনেকটা স্বাভাবিক। বোধ হয় হয়েও থাকে তা।

এবারেও নিশ্চয়ই। নহিলে ইহাদের উদ্ভব হয় কোথা হইতে?”

(‘শনিবারের চিঠি’, শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃ. ১২৯০-৯১)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ নাতি-পুত্র সুভো ঠাকুর ‘সত্যম বনাম সুন্দরম’ নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন :

“জনি ওয়াকার, হুইস্কির ইস্তাহারের বড়-বড় অক্ষরে প্রায়ই লেখা থাকতে দেখা গেছে :—‘বর্ণ ইন্ এইটিন সিক্সটি সিক্স স্টিল গোয়িং ষ্ট্রং।”

এর পর যখনই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এই মান্ধাতা আমলের মামুলি ‘বায়েত’টি নজরে পড়ে তখনই কি জানি কেন, অকারণ আনন্দে ঐ জনি ওয়াকারের ইস্তাহারটি অকস্মাৎ জেগে ওঠে আমার আত্মায়!

স্কটল্যাণ্ড বাসীদের মধ্যে জনি ওয়াকারের জনপ্রিয়তার মতই ব্রাহ্মমার্কা বহু পত্রিকার পাতায় আজও ঐ অতি পুরোণো উক্তিটির সম্মান অদ্ভুত ভাবে অক্ষুণ্ণ আছে লক্ষ্য করে আশ্চর্য্য হতে হয়!”

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

“দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি হইতে পারেন কিন্তু ভবিষ্যদ্দর্শী যে ছিলেন না তাহার প্রমাণ সুভো ঠাকুর।

হইলে, তাঁহারই কষ্টার্জ্জিত অর্থ তিনি কখনই তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যে লাগাইতে দিতেন না। সুভো ঠাকুর সত্য বলিয়াছেন—

সত্যের একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে
সে সাংঘাতিক, সেই কারণে
সে শিবও নয়, সুন্দরও
হতে পারে না।

“সাংঘাতিক!” (‘শনিবারের চিঠি’, ভাদ্র, ১৩৪৩, পৃ. ১৪৩৭-৩৮)

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ‘ব্যক্তিত্ব ও বেশ্যাবৃত্তি’ নামক একটি প্রবন্ধে সুভো ঠাকুর লিখেছেন :

“এই বিশ্বকবি কখনও মাড়োয়ারী মার্কা বেঙ্গল ষ্টোরের

দারোদঘাটন (sic), কখনও রূপবাণীর উদ্বোধন উৎসব, কখনও 'জলযোগ' অথবা 'মিষ্টিমুখ' দোকানের দধির আস্বাদন কিম্বা ইসলামিয়া আদর্শ ও বৌদ্ধ কলাচারের দোহাই দিয়ে হায়দ্রাবাদ হতে চীন অবধি অর্থ উপায়ের এই রকম কৌশলে কখনও তিনি আটকান নি, এই কারণে বহুবার বহুস্থানে মুসলমান হিন্দু ও বহুজাতের দ্বারা তাঁর বিশ্বপ্রেমের সতীত্বের সর্বনাশসাধন হয়েছে। এই বারান্দায়-দাঁড়ানো বিশ্বপ্রেম-সাধন যে ইচ্ছে সে তাই নিজের সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেচ্ছচার (sic) ভাবে ব্যবহার করতে পারে, চেক বই-এর চাকচিক্যে যদি হতে পারে সে চৌকোশ।

কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময় উৎপাদন করে টাউনহলে ভাঁড়ের ভূমিকায় শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে দেখে। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি আবোলতাবোল অনেক উপদেশ উদ্‌গার করেছেন। বিশেষ করে মুসলমানদের হস্তস্থিত ছুরিকার যথেচ্ছাচার নিবৃত্তির জন্য বহু বাক্য ব্যয় করতে হয়েছে তাঁকে। …কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হয়েছে এই—যে এর কিছুদিন পরেই এই সাহিত্যিকটি ঢাকা ইউনিভারসিটি হতে "ডক্টর অফ্ লিটারেচার" উপাধি পাওয়ার পর স্বেচ্ছায় উপরোক্ত মুসলমানদের ছুরিতেই নিজের ব্যক্তিত্বের কোরবাণী সাধন করে ঘোষণা করলেন: এর পর থেকে তিনি তাঁর উপন্যাসে একমাত্র মুসলমান নরনারীর চিত্র এঁকেই তাঁর বাকী জীবন অতিবাহিত করবেন।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "ইতিপূর্ব্বেই সুভো ঠাকুর বলিয়াছেন, সত্য হইতেছে সাংঘাতিক। উপরোক্ত কথাগুলি সাংঘাতিক—সত্য কি না জানি না।" ('শনিবারের চিঠি', ভাদ্র, ১৩৪৩, পৃ. ১৪৩৯ ৪০)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গ-বিভাগের শ্বেত ঐরাবত' রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শোনা যায়, পরম বৈষ্ণব। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "রাজা রামমোহন রায় বৈষ্ণবদের দু-চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তিনি তান্ত্রিক এবং শাক্ত ছিলেন, মদ্য পান করিতেন

এবং প্রত্যহ একটি আস্ত পাঁঠা ভক্ষণ করিতেন। কার্য্যব্যপদেশে বিলাত গিয়া অকালে প্রাণত্যাগ না করিলে আশা করিতে পারিতাম এখানকার পাঁঠার পালকে তিনি খতম করিয়া যাইতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি তাহা করিতে পারেন নাই।" ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৪৩ পৃঃ ১৪৭-৪৮)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৬ আশ্বিনের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন: "তিনি (রামমোহন) যে বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজীতে রচিত হইয়াছিল।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "রায় বাহাদুর যদি ১৮৩৩ সালের পূর্ব্বে এই উক্তি করিতেন কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না কিন্তু তিনি লিখিতেছেন ১৯৩৬ সালে। ১৮৩৩ সালে রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ তদ্ভাষা বিরচিত' প্রকাশিত হয়। সম্ভবত রায়-বাহাদুর আজীবন ইংরেজী চর্চ্চাই করিয়াছেন, বাংলার ধার ধারেন না। রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলী উল্টাইয়া দেখিবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নাই।" ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৪৩, পৃ. ১৪৮)

এই প্রবন্ধেই রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর লিখেছেন: "রামমোহন বাঙ্গলা গদ্যের জনক বা প্রথম লেখক কি না, সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে।....রামমোহনের চেষ্টায়ই আমরা অল্পদিনের মধ্যে ভূদেব, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইয়াছিলাম।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন:

"অতিরিক্ত বিনয়বশতই রায়-বাহাদুর নিজের এবং আমাদের জসীমউদ্দীন মিঞার নাম করেন নাই। কিন্তু আমরা সত্য গোপন করিব না, রামমোহনের চেষ্টাতেই আমরা এই দুই জনকেও পাইয়াছি।

'সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা রামের মা।' রায়-বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি না করিয়া যদি কোনও লেখাপড়ার কাজ লইয়া থাকিতেন তাহা হইলে জানিতে পারিতেন, রামমোহনেরও

পূর্ব্বে অন্তত আরও দশ জন জনকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে…।” ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৪৩, পৃ. ১৪৮)

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের সন্তান সুভো ঠাকুর লিখেছেন :

“আমি অগ্রাহ্য করি, অগ্রাহ্য করি বংশের জন্ম গৌরব
অস্বীকার করি নিজেকে তার প্রবাহ-রূপে।
স্বীকার করি না নিজের পিতাকে আর মাতাকে।”

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: “স্বীকার না করিবারই কথা, পাড়াটাই খারাপ।” ('শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩, পৃ. ৩০২)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্যের বাণী' নামক একটি প্রবন্ধে রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর লিখেছেন : “আমাদের দেশের রমণীর ঘোমটায় ঢাকা মুখ পাতায় ঢাকা ফুলের মত, তাহাকে দেখিতে হয় চেষ্টা করিয়া এবং দেখাইতে হয় আবরণ তুলিয়া।”

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: “প্রচুর বয়স এবং অর্থ থাকিলে মার না খাইয়াও চেষ্টা করিয়া দেখা এবং আবরণ তুলিয়া দেখান যায়, কিন্তু রায় বাহাদুর যাঁহাদের দেখেন তাঁহারা তো ঘোমটা দেন না।” ('শনিবারের চিঠি', ১৩৪৩, পৃ. ৪৫২)

একটি সাপ্তাহিকপত্রের একটি সংখ্যায় নিয়মাবলীতে লেখা হয়েছে : “সব লেখা চলতি ভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয়, অবশ্য সে ভাষা সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে, তাতে থাকবে সাহিত্যরস।”

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন:

“এই গেল থিওরি, প্র্যাকটিসে দেখিতেছি, সেই সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা' বিভাগে লেখা হইয়াছে—

এই বিলটী পাশ হইলে প্রত্যেক কোম্পানীকে রেজিষ্ট্রী করিবার সময় অন্ততঃ ৫০,০০০ টাকা মূলধন দেখাইতে হইবে। প্রত্যেক কোম্পানীকে দুই লক্ষ টাকা জমা দিতে হইবে সরকারের

নিকট। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক এই সমস্ত কার্য্য-প্রণালীর উপব লক্ষ্য রাখিবেন।

ইহা নিঃসন্দেহে চলতি ভাষা এবং বর্ত্তমানে ইহাই সাহিত্যরস।" ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র, ১৩৪৩, পৃ. ৮৯৪)

'প্রবাসী'র, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রথম প্রসঙ্গ—ইংরেজরা ভারতবর্ষে কেন আছে।

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "ইহার জবাব আমরা দিতে পারি। ইংরেজরা ভারতবর্ষে না থাকিলে 'প্রবাসী'তে আর্ট প্লেটে মুদ্রিত সম্রাট, সম্রাটদম্পতী ও সম্রাটপরিবারের ছবি দেখিবে কে?" ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ. ১৩৪৪, পৃ. ২৭৯)

একটি সচিত্র সাপ্তাহিকপত্রে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন: "স্বর্গীয় গিরীশ ঘোষের 'আলিবাবা'র মধ্যে এমন আবেদন আছে যা সারা জগতের সমস্ত লোক পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "সম্ভবত পারে, কিন্তু লেখক ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বলিদানে'র কথা স্মরণ করেন নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।" ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, পৃ. ২৯০)

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত এবং নৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত 'যৌন বিশ্বকোষে' শেষোক্ত জন লিখেছেন: "যৌনেন্দ্রিয় মানুষের পক্ষে যেমন মূল্যবান, তেমনি পবিত্র বলিয়া প্রতীত হইত বলিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও নিহত শত্রুর লিঙ্গ কাটিয়া ফেলিবার একটা রীতি সেকালে মধ্য-এসিয়ায় যোদ্ধাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বীর ডেভিড রণ-নিপাতিত ফিলিষ্টাইনদের দেহ হইতে সদ্যকর্তিত দুইশত লিঙ্গ শ্বশুরগৃহে উপহার দিয়া সল্-এর সুশ্রী দুহিতাকে ক্রয় করিয়াছিলেন।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "ফিলিষ্টাইনরা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হন নাই, এ যুগের বীর ডেভিড ব্যাপকভাবে অতখানি পরিশ্রম না করিয়া গোটা-দুইয়ের উপর দিয়া বীরত্ব ফলাইতে পারিলে আমরা

বাঁচিয়া যাইতাম।" ('শনিবারের চিঠি', ভাদ্র, ১৩৭৫, পৃ. ৮০১)

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'মৌচাকে'—অল্পবয়সীদের জন্য বিখ্যাত মাসিকপত্র—প্রসিদ্ধ পর্যটক ও সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল 'আসাম-ভ্রমণ' নামে একটি ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। শিলং থেকে অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ সাহিত্যবিশারদ জানিয়েছেন যে উক্ত ভ্রমণকাহিনীতে অসংখ্য ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি আছে। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "বেদজ্ঞ মহাশয় সাহিত্যিকজ্ঞ নহেন, ইহাই আমাদের বক্তব্য। উপন্যাসের রাজ্যে কল্পনার রঙিন পাখা উড়াইয়া কালীঘাট-বেলগাছিয়া ভ্রমণকেই যিনি 'মহাপ্রস্থানের পথে' করিয়া তুলিতে পারেন, পাড়ার মেথরানীর সহিত দুদণ্ডের সরস আলাপ যাঁহার লেখনীস্পর্শে বদাউনের রাজকুমারীর সহিত গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হয়, জয়ন্তীপাহাড়ের ভূগোল সম্বন্ধে তিনি যদি কিশোরদের হাটে কিছু ভুল তথ্যই পাচার করিয়া থাকেন, তিনি ক্ষমার্হ নহেন কি? কোন নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করিতে হইলে সেই নির্দিষ্ট স্থানে শারীরিক গতায়াত প্রয়োজন—এই বিংশ শতাব্দীতেও যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, সেই বেদজ্ঞদের দল সাহিত্যবিশারদ হইলেও অনাথবন্ধু নহেন। এ বিষয়ে আমরা সান্যাল মহাশয়েরই পক্ষে।" ('শনিবারের চিঠি', আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ. ৮৮৯-৯০)

'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে নরেন্দ্র দেব লিখেছেন: "'প্রবাসী' পত্রিকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র প্রবাসীতে লেখা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী থেকে যখন তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল যে, তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক ক'রে যেন পূর্ব্বাহ্নে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁরা সেটি মনোনীত করলে তবেই সে উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হবে,—এ সর্ত্তে শরৎচন্দ্র নিজেকে অপমানিত করতে রাজী হলেন না। একথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবি শুনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে 'প্রবাসী'তে রচনা পাঠাতে তাঁকে বারংবার

নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র তাই 'প্রবাসী'তে কখন কোন রচনা দেননি।"

এই অংশটুকু উদ্ধৃত করে 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"ইতিপূর্ব্বে (১৩৪৬ সালের ২২শে আষাঢ়ের পূর্ব্বে) এই বহিখানি ও ইহাতে লিখিত এই কথাগুলি আমি দেখি নাই। এই জন্য ইতিপূর্ব্বে এগুলির প্রতিবাদ করি নাই। ২২শে আষাঢ় ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আমি চিঠি লিখিয়া বা মৌখিক শরৎ বাবুকে কস্মিন্ কালেও 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করি নাই, কাহারও মারফৎও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই। তাঁহার উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। সুতরাং "তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক ক'রে পূর্ব্বাহ্নে" আমাকে পাঠাইতে কখনও বলি নাই।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ও পরে বারংবার নিষেধ করেন, ইহা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। সেই জন্য, এই খবর সত্য কিনা জানিবার নিমিত্ত কবিকে আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে লিখিত তাঁহার চিঠিটি নীচে মুদ্রিত হইল।

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই

জন্যে মরতে আমার সঙ্কোচ হয়। তখন বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে?

৯।৭।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কাল্পনিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি এবং রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, 'প্রবাসী'তে শরৎবাবুর উপন্যাস প্রকাশের জন্য আমার আগ্রহ প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ, শরৎবাবুকে তাঁহার উপন্যাসের চুম্বক পূর্ব্বাহ্লে আমাকে পাঠাইতে বলা, তাহাতে তাঁহার অপমানিত বোধ করা ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষুণ্ণ হওয়া, এবং শরৎবাবুকে রবীন্দ্রনাথের, একবার নয়, "বারংবার" 'প্রবাসী'তে লিখিতে নিষেধ করা– সর্ব্বৈব মিথ্যা।

এই কাল্পনিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি কিছু সত্য কথা লিখিত পারিতাম। কিন্তু লিখিতে গেলে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইত, তাঁহারা পরলোকে, সুতরাং তাঁহাদের সহিত মোকাবিলার উপায় নাই। অতএব, এইখানেই ইতি।" ('প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪৬, পৃ. ৫৭১-৭২)

কিন্তু এখানেই ইতি হয়নি। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন:

"...স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'তে লেখা দেওয়া ব্যাপারে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের একটি উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের লিখিত সাক্ষ্যসহ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার এক স্থলে আছে—

আমি চিঠি লিখিয়া বা মৌখিক শরৎবাবুকে কস্মিন কালেও 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করি নাই, কাহারও মারফৎও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই। তাঁহার উপন্যাস

'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ করি নাই।

আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী'তে লিখিবার জন্য মৌখিক এবং সাক্ষাৎ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুক্ত চট্টোপ্যাধায় মহাশয়ের পুত্র, 'প্রবাসী' কার্য্যালয়ের তদানীন্তন কার্য্যধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপ্যাধায়, জামাতা শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ প্রভৃতি একদিন রূপনারায়ণ-তীরবর্ত্তী সামতাবেড় গ্রামে শরৎচন্দ্রের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন শরৎচন্দ্রের কোনও বাংলা লেখা প্রস্তুত ছিল না; অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শরৎবাবুর কোনও কোনও লেখার অনুবাদ করিয়া 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশ করিবার অনুমতি লইয়া আসেন, ও ফলে 'বিন্দুর ছেলে'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

ভুল সকলেরই হয়, রামানন্দবাবুরও হইতে পারে!" ('শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ. ১৩৪৬, পৃ. ৬৫৩-৫৪)

ভুল সকলেরই হয়—সজনীকান্ত ভুল করে ১৯২৬ সালের বদলে ১৯২৮-২৯ সাল লিখে ফেলেছেন। পরে অবশ্য সজনীকান্ত নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। পরের কথা পরে হবে। আগের কথা আগে হোক।

নরেন্দ্র দেব আলোচ্য বিষয়ে একখানা প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন 'প্রবাসী'তে। পত্রখানা থেকে জানা যায় যে শরৎচন্দ্রের সহোদর প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: "কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সামতাবেড়ের বাড়ীতে রামানন্দবাবুর পুত্র অশোকবাবু, জামাতা কালিদাস নাগ মহাশয় এবং প্রবাসীর তদানীন্তন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় দাদার নিকট প্রবাসীর জন্য লেখা চাহিতে আসিয়াছিলেন।

প্রতিবাদপত্রখানা রামানন্দ ছাপিয়েছেন এবং তৎসহ নিজস্ব বক্তব্য ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২৫ শ্রাবণ, লিখেছেন। বক্তব্য থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি:

"কোন লোকের কাছে লেখা চাওয়া দোষের বা লজ্জার বিষয় নহে। আমি শরৎবাবুর কাছে লেখা চাহিয়া থাকিলে তাহা অস্বীকার করিতাম না।...

('প্রবাসী'তে লিখিবার জন্য) শরৎবাবুকে একাধিকবার অনুরোধ যদি একাধিক ব্যক্তি করিয়া থাকেন, তাহার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই। আমি কখনও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই, অন্যের দ্বারাও অনুরোধ করাই নাই।

... সামতাবেড়ে শরৎবাবুর বাড়ী শ্রীমান কালিদাস নাগ প্রভৃতি গিয়াছিলেন ইহা ঠিক। কখন ও কি জন্য গিয়াছিলেন, তাহা আমি তাঁহাদের যাইবার আগে ও ফিরিয়া আসিবার পরেও জানিতে পারি নাই। সুতরাং তাঁহারা আমার কোন শিষ্টাচারসম্মত নমস্কার সম্ভাষণাদি লইয়া যাইতে পারেন নাই, কোন অনুরোধ ত লইয়া যানই নাই।

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে শরৎবাবুর সহিত কালিদাস প্রভৃতির সাক্ষাৎকারের একটি সচিত্র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু সাক্ষাৎকারের তারিখ নাই। তাহাতে শরৎবাবুকে কোন প্রকার অনুরোধ করার কথা নাই। লেখাটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১লা প্রকাশিত জানুয়ারী সংখ্যা মডার্ন রিভিয়ুতে থাকায় বোধ হইতেছে সাক্ষাৎকার ১৯২৬ সালের কোন সময়ে হইয়া থাকিবে। নবেম্বরে হইয়া থাকিলে আমি তখন ভারতবর্ষে ছিলাম না। লীগ অব নেশ্যান্স দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া যে জেনিভা গিয়াছিলাম, সেই বিদেশ যাত্রা হইতে ১৯২৬ সালের ৩০শে নবেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

শ্রীমান কালিদাসকে এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, এক যুগ কাটিয়া যাওয়ার পর সেই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা সম্ভবপর নহে—যতটা তাঁহার মনে পড়ে তিনি জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র ও তিনি অনেক দিন হইতে শরৎচন্দ্রের

সহিত পরিচিত ছিলেন। কালিদাস ১৯২৩ সালের শেষে বিলাত হইতে ফিরিবার পর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শরৎচন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তাঁহার গ্রন্থাদির ভাল অনুবাদ না হওয়ায় পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে তাঁহার যথোচিত আদর হইল না। ১৯২১-২৩ সালে ইটালী ভ্রমণকালে কালিদাস অধ্যাপক জি. তুচ্চি ও অধ্যাপক বি. ফিল্লিপীর সহিত শরচ্চন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ শেষ হইলে ফিল্লিপী কালিদাসকে তাঁহার সহকর্ম্মী হইয়া শরৎবাবুর কিছু গল্প অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নানা কারণে কালিদাস ইহার ভার লইতে পারেন নাই। কিন্তু শরৎবাবুর তাঁহার সঙ্গে এই অনুবাদ প্রসঙ্গ একাধিক বার করিয়াছিলেন এবং তিনি শরৎবাবুকে জানান যে শ্রীমান অশোক অনুবাদ ভাল করেন ও তৎকৃত অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপা হইতে পারে, এবং এই কাগজের মারফতে বঙ্গের ও ভারবর্ষের বাহিরে বহু সাহিত্যসেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। কালিদাস প্রভৃতি সামতা বেড়ে গেলে শরৎচন্দ্রের সৌজন্যে ও আতিথ্যে যে মুগ্ধ হন তাহার প্রমাণ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত ও উপরে উল্লিখিত এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধে আছে। শরৎবাবু অশোককে 'বিন্দুর ছেলে' অনুবাদ করিতে বলেন। কালিদাস আমাকে ইহাও জানাইয়াছেন যে প্রবাসীতে লেখা দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের কোন কথা হয় নাই।…" ('প্রবাসী' ভাদ্র, ১৩৪৬, পৃ. ৭০০-০৩)

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"শরৎচন্দ্র আজ মান-অপমানের ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সমগোত্রজ রামানন্দবাবুর "শিষ্টাচারসম্মত নমস্কারসম্ভাষণাদি" সম্বলিত আলমগীরী রসিকতা তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না ; তা ছাড়া, জীবিত-কালে "রাসবিহারী"-চরিত্র-সৃষ্টিরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যুর পরেও তিনি করিতে বাধ্য…

…শ্রাবণের "সংবাদ-সাহিত্যে" 'প্রবাসী'র তরফ হইতে শরৎ-

সন্দর্শনে যাওয়ার কথা লিখিয়াছিলাম; শরৎচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে আমাদের নামটাও ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু জামাতা স্মৃতিধর "শ্রীমান কালিদাস" শ্বশুর মহাশয়কে জানাইয়াছেন, আমাদের সামতাবেড় যাত্রা কেবলমাত্র 'মডার্ণ রিভিউ'-এর অনুবাদ সম্পর্কিত এবং সম্পূর্ণ 'প্রবাসী'-নিরপেক্ষ। রামানন্দ পুত্র-জামাতার শরৎচন্দ্রের প্রতি অপমানসূচক মনোভাব (অর্থাৎ 'প্রবাসী'তে লেখা দিতে চাহিও না বাপু, 'মডার্ণ রিভিউ'-এ অনুবাদ ছাপাইয়া বিদেশে নাম করিতে চাহিয়াছ, দয়া করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে বাবাকে না জানাইয়া এতদূর আসিয়াছি) তখন যদি তাহাদের থাকিয়াও থাকে, মনে মনেই ছিল। প্রকাশ্যত শরৎচন্দ্রকে 'প্রবাসী'তে লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, এ কথা আমাদের স্মরণ আছে। তবে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনাকে যখন ১৯২৮-২৯ সালের ঘটনা বলিয়া গতবারের "সংবাদ-সাহিত্যে" ভুল করিয়াছি, তখন আমাদের স্মৃতি বিশ্বাস্য নাও হইতে পারে।

আমরা ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি এক শনিবারে সামতাবেড় গিয়াছিলাম, রামানন্দবাবু তখন বিদেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন এবং 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিউ'-এর সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে না জানাইয়া যদি 'মডার্ণ রিভিউ'-এর জন্য লেখা (হউক অনুবাদ) চাওয়া হইয়া থাকে, তাঁহাকে না জানাইয়া 'প্রবাসী'র জন্য লিখিতে অনুরোধ করাও অসম্ভব নয়। আইনের চুলচেরা ফাঁকিতে রামানন্দবাবু শরৎচন্দ্রের নিকট লেখা চাওয়ারূপ হীনতা ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করেন নাই, ইহা যেমন ভাবেই জাহির করিতে থাকুন, এ সত্য কখনই মিথ্যা হইবে না যে, 'প্রবাসী'র পক্ষ হইতে 'প্রবাসী'র কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের নিকট লেখা চাহিয়াছিলেন এবং তিনি লেখা দিবেন বলিয়াছিলেন। তাহার পর যোগাযোগ ঘটে নাই বলিয়া শরৎচন্দ্রের লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় নাই। সমস্ত ঘটনার সব চাইতে করুণ অংশ তাহাই।" ('শনিবারের চিঠি', ভাদ্র, ১৩৪৬, পৃ. ৮০৩-০৫)

ইষৎ অবান্তর হলেও বলি—রামানন্দের মৃত্যুর অনেকদিন পর সজনীকান্ত, সম্ভবত ১৯২৬-২৭ সালের শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে, লিখেছেন: "আমাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা তখন খুবই বাড়িয়াছে; আমরা অর্থাৎ অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ ও আমি ঘন ঘন ট্রেনযোগে ও পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়-পানিত্রাস-ভবনে যাতায়াত করিতেছি এবং যে শরৎচন্দ্রের মূল বাংলা রচনা নৈতিক কারণে একদা 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই, তাঁহারই গল্পের অশোক চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজী অনুবাদ সাদরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেছি। পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পুত্র করিতেছেন।"

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের 'পরিচয়ে' রমাকৃষ্ণ মৈত্র 'প্রতিপক্ষ' নামক একটি গল্পে লিখেছেন:

"সংসার বা সমাজের কোন জিনিষই তার (প্রভাকর) কাছে রহস্যপূর্ণ নয়। সে বোঝে সব, জানে সব।…প্রভাকর তার বাবার যৌন জীবনের একমাত্র দেহী চিহ্ন।…মা সুশ্রী, মা সুন্দরী। চল্লিশে পা দিয়েও তাঁর দেহের কোনও প্রত্যঙ্গ হয়নি শিথিল। পঁচিশের পরিস্ফুট যৌবন এখনো তাঁর দেহকে আকড়ে আছে।…মার মত সুন্দরী মেয়ে প্রভাকরের চোখে একটাও পড়েনি। সাদা মার্ব্বেল পাথরের উপর খোদাই করে যেন মার মুখ আঁকা হয়েছে। নাক, চোখ, গাল সব একেবারে নিটোল, নিখুঁত। মার যদি একটা মেয়ে হ'ত—প্রভাকর ভাবে, তার নিজের যদি একটা বোন থাকত; সে হয়ত মার চেয়েও সুন্দরী হ'ত। তাহলে, ওঃ তাহলে কি হ'ত? প্রভাকর চঞ্চল হয়ে ওঠে। মার সবটুকু সৌন্দর্য্য নিঙরে সে মেয়ে বেড়ে উঠত, আজ হয়ত সে মেয়ে ষোলো কি আঠোরোয় পা দিত। গোলাপী গাল, তীক্ষ্ণ চোখ, পাথরে খোদাই নাক—প্রভাকর আর ভাবতে পারে না।

তবুও মা সুন্দরী। ষোল বছর পর্য্যন্তও প্রভাকর মাকে জড়িয়ে

ঘুমিয়েছে—ষোল বছর পর্য্যন্তও ও মার বুকের গহ্বরে মুখ গুঁজে ঘুমিয়েছে। আজই যেন তার বয়স বাইশ হয়েছে।

মাকে প্রভাকর চিরকালই ভালবেসে এসেছে—যে ভালবাসা মার প্রতি সন্তানের ভালবাসা নয়। ফ্রয়েডীয় কম্‌প্লেক্সই বা হয়ত সেটা! তবুও প্রভাকর মাকে না দেখে থাকতে পারে না।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন:

"বঙ্কিমচন্দ্রের কালে এই তথ্য প্রচারিত হইলে 'বন্দে মাতরম্'—সমস্যা এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত না, কারণ ইহার পরে 'বন্দে মাতরম্' বলিতে তাঁহার ভবানন্দেরও বাধিত।

"প্রভাকর মাকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছে—বাবার ভাগ্য ভাল বলিতে হইবে! ('শনিবারের চিঠি', ভাদ্র, ১৩৪৬, পৃ. ৮১৩)

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ও ভাদ্রের 'ভারতবর্ষে' যামিনীমোহন করের 'মিটমাট' নামে একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়েছে। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন কর 'ভারতবর্ষে'র শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় 'মিটমাট' নামক যে নাটিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন, অনবধানতাবশত তাহাতে একটি ফুটনোট যোগ করিতে ভুলিয়াছেন। ফুটনোটটি এইরূপ হইবে—'R. K. O. Radio Production কোম্পানির Bachelor Mother চিত্র অবলম্বনে লিখিত।' আমরা যামিনীবাবুর তরফ হইতেই লিখিতেছি।" ('শনিবারের চিঠি', আশ্বিন, ১৩৪৭, পৃ. ৮৩৯)

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'প্রবাসী'র পুস্তক-পরিচয় বিভাগে 'ক' (স্বয়ং সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম নাকি?) সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা দেবী প্রণীত 'সিঁথির সিঁদুরে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: "ইংলণ্ডের একাধিক শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে ইহার কোন কোন গল্পের—যেমন 'শিক্ষার পরীক্ষা' ইংরেজী অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল" এবং আরেক কন্যা সীতা দেবী প্রণীত 'পরভৃতিকা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: "গ্রন্থকর্ত্রী কর্তৃক ইহার

ইংরেজী অনুবাদ যখন এলাহাবাদের বিখ্যাত দৈনিক 'লীডার' কাগজে বাহির হইত, তখন তাহার কাটতি বাড়িয়া গিয়াছিল।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "পুস্তক-পরিচয়ের আদর্শ এইরূপই হওয়া উচিত। কোন লেখার জন্য কোন পত্রিকার কাটতি বাড়িয়াছিল, কোন উপন্যাস পড়িয়া কোন দেশের রাণীর 'মাথাধরা' সারিয়াছিল, ইহা জানিবার জন্যই তো পাঠকের আগ্রহ! দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা 'প্রবাসী'-সম্পাদকের কন্যা নই, হইলে, আমাদের যে প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের এক আত্মীয়া তিন মিনিটে হাঁসের মাংস সিদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার সংবাদও 'প্রবাসী' পাঠকেরা পাইতেন! 'ক' শুধু কৃষ্ণপ্রেমই জাগ্রত করে না, ওই পুঁটুলিসম্বল ত্রিকোণাকার অক্ষরটি ভেদ করিয়া পিতৃস্নেহও উপচিয়া উঠিতে পারে।" ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৪৭, পৃ. ১৪৩)

'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রামমোহনপন্থী এবং রামমোহন, সকলেই জানেন, প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন। এমতাবস্থায়ও ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'প্রবাসী'র মলাটের প্রথম ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় এবং পেটের মাঝখানে দুর্গা প্রতিমার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "রামমোহন রায় প্রতিমা-পূজার বিরোধী ছিলেন এবং 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রামমোহন-পন্থী। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন কার্তিকের 'প্রবাসী'তে দেখিলাম, মলাটের প্রথম ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় এবং পেটের মাঝখানে দুর্গা-প্রতিমার ছবি জ্বলজ্বল করিতেছে, তখন এই কথাই স্মরণ হইল যে, বিশেষ কারণে রেলকর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার অপেক্ষাও থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের (সমবেতভাবে) খাতির করিতে বাধ্য হন। শূন্যদেবতা গণদেবতার কাছে চিরদিনই পরাস্ত।" ('শনিবারের চিঠি', পৌষ, ১৩৪৭, পৃ. ৪১২)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত 'কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি প্রবন্ধে খগেন্দ্রনাথ মিত্র (অধ্যাপক, রায়

বাহাদুর) লিখেছেন: "একদিন প্রাতে জোড়াসাঁকোয় কবির ভবনে গিয়াছি, তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ওহে তোমার ঘড়ির দরকার আছে? যদি থাকে ত এই ঘড়িটা নিতে পার।' আমি ঘড়িটি দেখিলাম, হ্যামিলটনের প্রকাণ্ড সোনার Chronometer ঘড়ি—উপরে R.T. মনোগ্রাম। দাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ৩৫০ টাকা; আমি চমকিয়া উঠিলাম দেখিয়া কবি বলিলেন, 'দেখ, একজন ১৫০ টাকায় ঘড়িটি নিতে চেয়েছে, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা নয়, তাকে দিতে। তুমি যদি নেও ১২৫ টাকায় পেতে পার।' আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "এই অতি গুহ্য transaction-এর কথা প্রকাশ না করিলে আমরা রবীন্দ্র-চরিত্রের আর এক দিক জানিতেই পারিতাম না। তাঁহারও যে টাকার অভাব হইত এবং তিনিও যে সাধারণ দোকানদারসুলভ বাকভঙ্গিতে পটু ছিলেন (যেমন সাক্ষাৎ খরিদ্দারকে খুশি করিবার জন্য কল্পিত পূর্ব্ব ক্রেতা অপেক্ষা তাঁহাকে ২৫ টাকা কমে ঘড়িটি "অফার" করা ইত্যাদি) রবীন্দ্রনাথের এই নূতন পরিচয় রায় বাহাদুর রবীন্দ্র বিয়োগে অতিরিক্ত শোকাবেগ-বশতই গোপন করিতে পারেন নাই। বুঝিতেছি, বার্দ্ধক্যহেতু তাঁহার চরিত্রের কলপ-কালোপ্রস্তরকঠিন দৃঢ়তা কিছু নরম হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তো তাঁহাকে এরূপ বেসামাল হইতে দেখা যায় নাই! ব্যক্তিগত গোপন কথাগুলি তিনি গোপনই রাখিতে পারিয়াছিলেন! বার্দ্ধক্য এবং বন্ধু বিয়োগ উভয়ই মিলিয়া এতদিনে যে সৌম্যসংযত রায় বাহাদুরের মানুষ-মূর্তি আমাদের নিকট প্রকট করিল, ইহাতে আমরা খুশিই হইয়াছি।" ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৪৮, পৃ. ১৩৯-৪০)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'ভারতবর্ষে' ক্ষিতিমোহন সেন 'আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন: "কবির খাদ্য দেখিলাম, খুব সাদাসিধা, নিরামিষ। তাতে ঝাল বা মশলা নাই। তবে ফল ও মিষ্ট তাঁহার প্রিয় ছিল। আমাকেই তিনি ফলের রাজা বলিতেন।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সংযমী পুরুষ ছিলেন, ইহা হইতেই উপলব্ধি হইবে। সেন মহাশয়কে 'ফলের রাজা' জানিয়াও তিনি কখনও খাইবার চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য আমরা গুরুপরম্পরায় জানি ও ফল না খাইবার চেষ্টা করাই তাঁহার পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে।" ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৪৮, পৃ. ১৪৩)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে' নামক একটি প্রবন্ধে রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন: "আমরা যে সময়ে ছাত্র, অথবা ছাত্রজীবন অতিক্রম করিয়াছি মাত্র, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'আমায় গাহিতে বলো না', 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী', 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে' প্রভৃতি গান শুনিয়া আমরা কত আনন্দ পাইতাম, কিরূপ আত্মহারা হইতাম, তাহা এখন কেমন করিয়া বুঝাইব?"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "'গীতিমাল্য' খুলিয়া দেখিতেছি, 'তুমি যে সুরের আগুন' গানটি ১৩২০ বঙ্গাব্দের ২৪ চৈত্র অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় মাঝামাঝি কালে লিখিত; গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তখন লাগে লাগে। ইহার প্রায় দেড় যুগ পূর্ব্বে রায় বাহাদুর ছাত্রজীবন খতম করিয়াছেন! শুনিয়াছি, রায় বাহাদুরের স্বপক্ষ বিপক্ষ বহু পক্ষ আছে। কোন পক্ষকে কাবু করিবার জন্য তিনি এই পাশুপত অস্ত্রটি প্রয়োগ করিয়াছেন, জানিতে বাসনা হয়।" ('শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, পৃ. ২৬৬)

'পূর্বাশা'র রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন:

"সে যাই হোক, আমরা যারা এখনও ইহলোকে আছি, আমরা কি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাকবিস্তার করবার জন্যই আছি? আশা করি তা নয়।

আমাদের জীবনের বিশেষ কোনও সার্থকতা না থাকলেও এ

অবস্থায় লেখা অসম্ভব।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : "এই পংক্তিটির পরে আরও পুরা দুই পৃষ্ঠা নীরবতা আছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে চৌধুরী মহাশয় মাত্র এগারোটি প্রবন্ধে বাকসংযম করিয়াছেন।" ('শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, পৃ. ২৬৭)

সজনীকান্তের মতে বুদ্ধদেব বসুর রচনার অধিকাংশেরই ভাব, ভাষা, ভঙ্গি ইংরেজী; মূল ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে না জানিয়া শুনিয়া অনেক আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার যে পরিচয় পাইতেছি তাহাতে পূর্ব্বকৃত আলোচনার জন্য লজ্জাবোধ করিতেছি। তিনি বাংলা সাহিত্যের কেহ নন, আজ পর্য্যন্ত বঙ্গাক্ষরে এবং বঙ্গভাষায় যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন তাহার অধিকাংশেরই ভাব, ভাষা, ভঙ্গি ইংরেজী; মূল ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ। এই সত্য এতদিন যে কেন বাহির হয় নাই, তাহা বিস্ময়কর। **Aldous Huxley, Michael Arlen** এবং **D. H. Lawrence**-এর রচনার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখেন, এমন অনেক সুধী ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যের সহিত সম্পর্কিত; সম্ভবত তাঁহারা বুদ্ধদেব বসুর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ পড়িবার মত হীনতা স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না, এই কারণেই মূল ও জালের আশ্চর্য্য মিল এতকাল ধরা পড়ে নাই। সম্প্রতি বাংলা দেশের জনৈক সাহিত্যিক বিশেষ পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধদেবের স্বরূপ ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রমলব্ধ উপকরণ তিনি আমাদের পাঠাইয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতেছি, বসু মহাশয়ের অধিকাংশ উপন্যাস ও গল্পের প্লট এবং বর্ণনা পর্য্যন্ত ইংরেজী হইতে গৃহীত; এই চুরি প্রধানত হাক্সলি ও আরলেন হইতে করা হইয়াছে; ব্যক্তি ও বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যগুলি পর্য্যন্ত ইংরেজী হইতে গৃহীত, স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্বন্ধে বসু মহাশয়ের রচনায় যে সুগভীর ধিক্কার ও উন্নাসিক ঘৃণা প্রকাশ

পায়, তাহাও হাস্যকর; তাঁহার কবিতার ভাব ও শব্দযোজনা বহুক্ষেত্রেই **Pre-Raphelite** এবং **Decadent** যুগের ইংরেজ কবিদের রচনা হইতে গৃহীত। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী নামগুলি বাংলায় লিখিতে গিয়া বসু মহাশয় মারাত্মক উচ্চারণের ভুল করিলেও মোটামুটি তিনি যে ইংরেজী ভাল জানেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের নিকট প্রেরিত উপকরণের সাহায্যে বুদ্ধদেব বসুর স্বরূপ প্রকাশ করিতে যে স্থানের প্রয়োজন, এবারে তাহা দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া আমরা তাহা হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি, ভবিষ্যতে একটি দীর্ঘ রচনা আমাদের পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

*　　　*　　　*

বুদ্ধদেব বসু। "ও একটা জিনিষ ভয় করে, সেটা হচ্ছে কোনো জিনিষ miss করা।·· ওকে ফাঁকি দেবার জন্য সবাই যেন ষড়যন্ত্র করছে, এমনি একটি সন্দেহ ওর মনে। ···পাছে ওর অনুপস্থিতিতে কেউ কোন ব্রিলিয়েণ্ট কথা বলে ফেলে, কোনো মা-ভলাস কাজ করে ফেলে···"—'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' শীলার দেওয়া চন্দ্রিকার বর্ণনা।

Huxley। **"Mrs Aldwinkle was perpetually haunted by the fear that she was missing some thing. For a number of years now the universe had always seemed to be conspiring to keep her away from the places, where the exciting things were happening and the wonderful words were being said."** **Those Barren Leaves**

বুদ্ধদেব বসু। "আকাশ না দেখলে ও নাকি বাঁচতে পারে না। আরপুলি লেইনে দোতলার যে ঘরে ও থাকে, সেখান থেকে কয়েক গজ আকাশ দেখা যায়; ঐ আকাশটুকু ও কিনে নিয়েছে: কেউ গেলেই জানালার কাছে নিয়ে যেয়ে বলবে 'দেখছেন আকাশ?' ···চন্দ্রিকার নিজস্ব আকাশকে প্রশংসা করে তখন কথা বলতে হয়··· 'আর দেখেছ আকাশের তারা! ···দেখেছ কি রকম বড়; আর কি উজ্জ্বল।' আকাশের তারাগুলি যে তারি সম্পত্তি, সে বিষয়ে তার কথার ধরণে

হ কোন সন্দেহ থাকতে দিল না। …তারাগুলো যেন এক রহস্যের ভার লুকিয়ে রাখতে না পেরে কাঁপছে।”—ঐ

Huxley। “The view was now her property. It was therefore the finest in the world·· It was same with the landscape. It was here down to the remote horizon… Mrs A. had even bought the stars. How bright they are! …and how they twinkle! How they palpitate!” —ঐ

বুদ্ধদেব বসু। ‘তুমি জানোও না সুনীল, আমি তোমাকে কত ভালবাসতে পারতাম—ভাবতেও পারো না। অত্যাচারের মত হিংস্র ভালবাসা;—আবার, ঘুমের মত নরম। রুগ্ন শিশুর মত অসহায়; আবার বিশাল সেনাবাহিনীর মত ক্ষমতায় অপরাজেয়। তুমি তা ভাবতেও পারো না, সুনীল।” —সুনীল আর লুসি-ললিতা

Huxley। “You don't know what love can be. You don't know what I can give to you. Love, that's desperate and mad, like a forlorn hope. And at the same time tender, like a mother's love for a sick child. Love that is violent and gentle, violent like a crime and as gentle as sleep.”—**Point Counter Point.**

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু ভাষার যে ভঙ্গিমার জন্য প্রসিদ্ধ, যে সকল বিচিত্র উপমার আঘাতে তরুণ পাঠকেরা বিহ্বল ও আত্ম-বিস্মৃত হয়, দেখিতে পাইতেছি তাহার অধিকাংশই বসু মহাশয়ের বিচিত্র হজমশক্তির পরিচায়ক। স্বীকারোক্তিতে যাহা গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, অস্বীকৃতিতে তাহাই দোষ হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমাদের দুঃখ।” (‘শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৪৯, পৃ. ৫৫৬-৫৮)

একটি গল্পের নায়িকা যৌবনবতী ও লাবণ্যবতী রিজিয়া। গল্পটি থেকে অংশবিশেষ: “রিজিয়া নিজের ঘরে বসে-বসে পা দোলাচ্ছে আপন মনেই। কোনো একটা বিষয় ভাবতে-ভাবতে সে অকারণেই

কোলের ওপর বাঁ-হাত দিয়ে সাড়ির আলগা অংশ রগড়াচ্ছিল। ধীরে-ধীরে কখন যে হাঁটু পর্যন্ত লাল সায়ার সাথে-সাথে সাড়িখানা উঠে এসেচে, তা সে মোটেই লক্ষ্য করে নি। চোখ পড়তেই সে অত্যন্ত চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি নামাতে যেয়ে পায়ের দিকে চোখ পড়তেই আবার চমকে পড়লো, এবং পরক্ষণেই দরজার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালো। কাঁপা পায়ে দ্রুত হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে রিজিয়া দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলো মুখ চোখ বুক-পীঠ ভরে। একটা অনাস্বাদিত সামগ্রীর আবিষ্কারের নেশায় রিজিয়া তখন কামাতুরা। অসহ্য শিহরণ-ধারা তাকে পুড়িয়ে অঙার করে ফেলতে চাচ্ছিল। নেশাতুরার মতো দুর্বল পায়ে স্তিমিত ইন্দ্রিয় নিয়ে বিছনেয় গিয়ে পা তুলে সে বসলো। পরিশেষে আবার পায়ে থেকে সাড়ি তুলে সে তার পা দুটো পরীক্ষা করতে লাগলো। দু-হাতে স্থানে-স্থানে টিপে-টিপে দেখতে লাগলো।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"পাঠক নিশ্চয় নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া একটা কিছু কেলেঙ্কারির প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরাও করিয়াছিলাম। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জানেন? কি দেখিয়া রিজিয়া কামাতুরা—অসহ্য শিহরণ-ধারায় দগ্ধ হইয়া অঙার? শুনুন—

মিহি সোনালি রোমে সমস্ত পা-টা একটা
অপূর্ব রূপ-শ্রীধারণ করেচে, মাংসালো পায়ে রঙ
ধরেচে কাচা হোলুদের।

বুঝুন, আধুনিক সাহিত্যের perversity কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। রোমেই যদি এই, বার্লিনে না জানি কি হইবে? হয়তো রিজিয়া আর বাঁচিবে না।" ('শনিবারের চিঠি', আশ্বিন, ১৩৪৯, পৃ. ৭২২)

বিহার প্রদেশের স্কুলসমূহের চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী 'আদর্শ-অঙ্ক-গণিতে'র পঞ্চম ভাগে অধ্যাপক গায়ত্রীপ্রসাদ উপাচার্য ঐকিক-নিয়ম-বিষয়ক একটি প্রশ্ন দিয়েছেন : "১০ বৎসর বয়সের সময় আবদুল

৪ ফিট লম্বা ছিল। ৪০ বৎসর বয়সের সময় সে কত ফিট লম্বা হইবে?"

এই অঙ্কটি উদ্ধৃত করে ভাগলপুর থেকে অমূল্য রায় লিখেছেন: "ইহা ধাঁধা বা জামাই-ঠকানো প্রশ্ন নহে। ঐকিক নিয়ম-বিষয়ক অঙ্ক। সুতরাং আবদুল ৪০ বৎসর বয়সে ১৬ ফিট লম্বা হইবে। মাত্র নাস্তিক ধারণা প্রচার করিয়া Athens-এর সুকুমারমতি যুবকগণের মন কলুষিত করিয়াছিলেন, এই অপরাধে Socrates-কে hemlock পান করিতে হইয়াছিল। এইরূপ পাটিগণিত-প্রণেতাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত?"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "অমূল্যবাবু যদি আরও একটু রসিক হইতেন, তাহা হইলে উপাচার্য্য মহাশয়ের গণিতে আর একটি অঙ্ক সন্নিবিষ্ট করিতে অনুরোধ জানাইতেন। অঙ্কটি এই—১০ বৎসর বয়সের সময় ক-এর একজন বাবা ছিল, ৩০ বৎসর বয়সের সময় কয়জন বাবা হইবে? আমরাও সে অনুরোধ করিব না, বলিব, উপাচার্য্য মহাশয়কে অচিরাৎ বেহার প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর পদে বাহাল করা উচিত।..." ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৪৯, পৃ. ১৭৬-৭৭)

১৩১০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে কমলা দেবীর 'উপন্যাসে গ্রাম ও গ্রাম-জীবনের আদর্শ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "...জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে শ্রীমতী কমলা দেবীর 'উপন্যাসে গ্রাম ও গ্রাম-জীবনের আদর্শ' প্রবন্ধটি পড়িয়া অনেক ভরসা পাইলাম। 'মডার্ন রিভিউ'য়ে দেখিলাম প্রবন্ধ-লেখিকা পুরস্কৃত হইয়াছেন, বিচার করিয়াছেন স্বয়ং 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সাত পৃষ্ঠার প্রবন্ধে যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' উপন্যাসের কোটেশন তিন পৃষ্ঠা এবং শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী প্রণীত 'অলখ-ঝোরা'র কোটেশন তিন পৃষ্ঠা। 'অলখ-ঝোরা' 'প্রবাসী'তেই বাহির হইয়াছিল, সুতরাং 'প্রবাসী'র পাঠকদের ডবল লাভ হইল। এই প্রবন্ধ পাঠে বাংলা দেশের গ্রাম সম্পর্কে আমাদের

অনেক অজ্ঞতা দূর হইল। আমাদের একটি মাত্র আপত্তি এই যে, বাংলা দেশের গ্রামের পরিচয় দিতে গিয়া লেখিকা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা' হইতে কোটেশন দিলেন না কেন ?" ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০, পৃ. ১৫৫)

নিজস্ব ভঙ্গিতে 'শনিবারের চিঠি' দেখিয়েছে যে বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি মৌলিক রচনা আসলে বিদেশী লেখকদের রচনা থেকে অপহরণ। সেদিকে ইণ্ডিয়ান পি. ই. এন-এর সম্পাদিকা সোফিয়া ওয়াডিয়ার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে চিঠি লিখেছেন সেওড়াফুলির মহামায়া-সাহিত্য-মন্দিরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জবাবে সোফিয়া ওয়াডিয়া লিখেছেন :

"I have looked into a recent issue of the Sanibarer Chithi. There the charge against Budhadev is not that he is a writer of obscene literature, but that he is a plagiarist from Alduous Huxley, Michael Arlen etc. In my opinion both these charges might have some foundation ten years ago when he was an unemployed youngster struggling for his daily bread with the help of his pen. There was then a public demand for hot stuff brewed in foreign lands, but bottled in Bengal."

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : "মাকে মামার বাড়ির সংবাদ দিবার প্রবৃত্তি দেখিতেছি শুধু বাংলা দেশেরই একচেটিয়া নহে। বুদ্ধদেববাবু কলিকাতায় তথাগত অবস্থায় এতখানি বিব্রত হইয়াছিলেন কি না, তিনিই বলিতে পারিবেন।" ('শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ, ১৩৫০, পৃ. ৩১৩-১৪)

জনৈক আধুনিক কবি লিখেছেন :

"আধুনিক কবি আমি
আমার প্রথম প্রিয়া
চলে গেছে দূরে—বহু দূরে—

পতি পরম গুরুর পাশে।
তবু আজো তার
অলক-সৌরভ নিয়ে
রক্তরাঙা মিষ্ট ওষ্ঠপুটে
দিয়ে যায় চুম্
আমার নয়নে এসে
জনশূন্য পাহাড়িয়া স্রোতস্বিনীকূলে।
যুগছায়া কাঁপে জলে।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"পরস্ত্রী সম্বন্ধে কবিরা নাম না করিয়া এরূপ উক্তি করিতে পারেন অবশ্য ; কিন্তু তাহার পর কবির অবস্থা শুনুন—

মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ি
রিক্ত বক্ষে মাথা রেখে অলস তন্দ্রায়।

পাঠক, এইভাবে একবার শুইবার চেষ্টা করিয়া দেখুন তো, কায়দা করিতে পারেন কিনা ? যদি বলেন যে, প্রেয়সী কথাটা উহ্য আছে, এটুকু বুঝিতেছ না ? বুঝিতে পারিতাম যদি না তৎক্ষণাৎ—

কি প্রলাপে সর্ব অঙ্গ কেঁপে ওঠে
শুনে তার স্তনের স্তনন

শুনিতাম। 'রিক্ত বক্ষে'র সহিত শেষোক্ত দুইটির যোগ না থাকাতেই গোলমাল হইয়া গেল।" ('শনিবারের চিঠি', বৈশাখ, ১৩৫১, পৃ ৭৮-৭৯)

১৩৫১ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত 'আলীগড় আন্দোলন' নামক একটি প্রবন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন যে এ দেশে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক কোনোদিনই প্রীতিকর ছিল না ; হিন্দুদের মতলব বরাবরই খারাপ। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : "তিন চার পুরুষ পূর্বে কোনও কোনও হিন্দু যখন ইসলাম বরণ করিয়াছিল, তখনও তাহাদের মতলব নিশ্চয়ই ভাল ছিল না।

সেই সকল গোপন ইতিহাসও শামসুদ্দীন সাহেব প্রকাশ করিয়া দিলে ভাল হয়।" ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১, পৃ. ১৫৭)

'শকুন্তলা'কে সম্বোধন করে অমৃতকুমার দত্ত নামে একজন কবি লিখেছেন :

"এখন যদি ডাক দি, যদি বলি—এসো।
এসো তোমার আভিজাত্যকে অতিক্রম করে'
শাড়ী আর সায়ার মিথ্যা মোহকে ছেড়ে
ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের আলো-কে অন্ধ করে'
এসো, আমার এই রিক্ত শূন্য হাতে
রাখো তোমার নরম হাত।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : "শকুন্তলারা যদি শাড়ি আর সায়ার মিথ্যা মোহকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা দুষ্মন্তেরাও না কোন ধুতি-লুঙ্গির মোহ ছাড়িতে পারিব। 'তোমার আভিজাত্যকে অতিক্রম করে' হইতেই মালুম হইতেছে লেখক কোন সম্প্রদায়ের। ইঁহারা যদি একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আসন্ন ঘোরতর বস্ত্রসঙ্কটে সারা বাংলাদেশই মিথ্যা মোহ ছাড়িয়া সরকারকে এবং পুঁজিবাদীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে পারিবে।" ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র, ১৩৫১, পৃ. ৩৭৬-৭৭)

রবীন্দ্র-তিরোধান-দিবস উপলক্ষে সারা বাংলা দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র, ১৩৫২ বঙ্গাব্দের কথা, বিশেষ সমারোহের সঙ্গে রবীন্দ্র-সপ্তাহ পালিত হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্যতায় রবীন্দ্রভক্ত সংখ্যাবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মর্মপীড়া পেয়েছেন। প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এ-বিষয়ে প্রশান্তচন্দ্র যা বলেছেন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে : "আমি রবীন্দ্রনাথের খুব কাছে থাকার সুযোগ বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ পেয়েছিলাম। শোকসভা সম্পর্কে কবির মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি। তিনি শোকের বাহ্যিক উচ্ছ্বাসের পরিপন্থী ছিলেন। ...তিনি বলেছিলেন—

প্রশান্ত, আমার মৃত্যুর পর স্মরণসভার সভাপতি খুঁজে বেড়িও না। অনেক দুঃখের সহিত তিনি ঐ কথা বলেন। গভীর বেদনা ছিল ঐ কথায়। বাঙ্গালা দেশে অনেক সময় শোকের বাহ্যিক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। কবিকে তা অত্যন্ত পীড়া দিত। কবি বলেছিলেন একদিন, প্রশান্ত, আমার বিদেশে মরতে ইচ্ছা করে রামমোহন রায়ের মত। কবির স্মরণানুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করা উচিত। কবি বলেছিলেন, প্রশান্ত, হাততালি সম্বন্ধেও আমার আপত্তি আছে। উচ্ছ্বাসপ্রবণতা তিনি চাইতেন না।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"কিন্তু এই বক্তৃতাটির পরই সংবাদপত্রে এই পংক্তিটি দেখিয়া আমরাও মর্মপীড়া পাইলাম—'অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ সভার কার্য পরিচালনা করেন।'

ইহার পর দুষ্টলোকেরা যদি হাততালি দেয়, আশা করি প্রশান্তবাবু ক্ষমা করিবেন। প্রশান্তকে বারবার এইভাবে সম্বোধন না করিয়া রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু বলিতেন, প্রশান্ত, আমাকে লইয়া ন্যাকামি করিও না—তাহা হইলেই সম্ভবত কাজ ভাল হইত।

আর এক কথা। প্রশান্তবাবু যদি রবীন্দ্রনাথের সহিত ত্রিশ বৎসরের সাহচর্যে সন্তুষ্ট না থাকিয়া রবীন্দ্র-জীবনের আরও কুড়ি-বাইশ বৎসরের আগেকার কথা জানিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে অবগত হইতেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোকসভা লইয়া কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার একবার বাদানুবাদ হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র শোকসভায় ঘটা করিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশের বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শোকোচ্ছ্বাসের পক্ষে চমৎকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা সংখ্যাবিজ্ঞানের কথা নয়, ইতিহাসের কথা।" ('শনিবারের চিঠি', ভাদ্র, ১৩৫২, পৃ. ৬৯২-৯৩)

'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' নামক গ্রন্থে দিলীপকুমার রায় নিজের

মেসোমশায় গিরিশ শর্মা সম্বন্ধে লিখেছেন :

"একবার কার একজনের অটোগ্রাফের খাতায় তিনি লিখেছিলেন নিজের রচিত একটি চতুষ্পদী—মাসিমার মৃত্যুর পরে—

সুখ নাহি পাওয়া যায় সুখেরে খুঁজিলে
প্রেম দিলে প্রেমে ভরে প্রাণ।
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান॥

চারটি লাইনে একটি সমগ্র জীবনের মূলমন্ত্র এমন অপরূপ ক'রে কয়জন কবি প্রকাশ করেছেন জানি না।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক একজন কবি অতিশয় যৌবনকালে ('কড়ি ও কোমল'—"পত্র" (১)) এই ভাবসমন্বিত কয়েকটি ছত্র লিখিয়াছিলেন একটি সুবৃহৎ কবিতায়, তবে তাঁহার ভাষাটা ছিল একটু ভিন্ন। এইরূপ—

সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ,
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

সামান্য ভাষান্তর ঘটিলেও ভাবের এই প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথ স্বর্গলোকে কৃতার্থ হইবেন।" ('শনিবারের চিঠি', আশ্বিন, ১৩৫২, পৃ. ৭৬৪)

মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রবন্ধ পড়ে সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ প্রায় বাল্যকালে মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে (১২৮৪ বঙ্গাব্দে) মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে যে বিরূপ কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে বারংবার বিবিধ কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ

একদিন আমাদের কাছে তাঁহার বিরূপতার মৌলিক কারণ স্বরূপ গৃহশিক্ষকের একটি আকস্মিক চড়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'কবিতা'-সম্রাট বুদ্ধদেব বসু আজ প্রৌঢ় বয়সে রবীন্দ্রনাথের বাল্যের ভুলটারই সাফাই গাহিতেছেন,—মধুসূদনকে গালি গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের চাটুবাদ। যে চড়ে বালক রবীন্দ্রনাথের মানসিক অসুস্থতা ঘটিয়াছিল, প্রৌঢ়ের সুস্থতার জন্য সেরূপ একটি চড়ের প্রয়োজন।

বুদ্ধদেব বসু মধুসূদনের চূড়ান্ত শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, যথা—

> মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার। তাঁর নাট্যরাজি অপাঠ্য, মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ। তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমন কি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাঙ্গনা কাব্যেও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। প্রহসন দুটিও কাঁচা হাতের কৃশাঙ্গ নকশা মাত্র, অনেকটাই তার ছেলেমানুষি। মেঘনাদবধ কাব্য বানিয়ে-তোলা জিনিস। সমগ্র কাব্যটি হয়েছে ছাঁচে-ঢালা কলে-তৈরি নির্দোষ নিষ্প্রাণ সামগ্রী; অন্তঃপুরে অনধিকারী; কিঞ্চিদধিক ছয় সহস্র পংক্তির মধ্যে দুটি চারটির বেশি নেই যা প'ড়ে মনে হয় কবি কিছু বলতে চেয়েছিলেন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব বলতে গেলে শূন্য, এমন কি মোহিতলালের প্রশংসনীয় উদ্যম সত্ত্বেও তাঁর প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পর্যন্ত জাদুঘরের মূল্যবান নমুনা হয়েই রইলো; মাইকেলে শুধু আঁকাড়া অনুকরণ; মেঘনাদবধ কাব্য দৃষ্টিহীন গতানুগতির একটি অনবদ্য উদাহরণ। তিনি ভীরুতায় তাঁর অবজ্ঞাভাজন রামেরই সমকক্ষ, রাম ধর্মভীরু আর তিনি প্রথাভীরু। তাঁর অনুপ্রাস শিশুতোষ, উপমা দ্যুতিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। শুধু যে বাংলা ভাষার প্রকৃতি বোঝেন নি তা নয়, সাহিত্যের আদর্শ নির্বাচনেও

মাইকেল ভুল করেছিলেন। যদিও অনেকগুলি ভাষা লিখেছিলেন এবং পড়েছিলেন বিস্তর, তবু একথা মনে করতে পারি না যে তিনি ঠিকমতো পড়াশুনো করেছিলেন কিংবা পড়াশুনোকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। মাইকেল বিদ্যার অনুধাবন করলেও রুচি অর্জন করেন নি, বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভূত শক্তির প্রভূত অপব্যয়ের হেতু চারিত্রগুণের অনটন।

এই সকল অর্বাচীন অশ্রদ্ধেয় উক্তি প্রতিবাদের অযোগ্য, বুদ্ধদেবকে যাঁহারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, তাঁহাদের কাছে মাত্র এই সকল আপ্তবাক্য মর্যাদালাভ করিতে পারে। আসল সত্য ইহাই যে, বসু মহাশয় তাঁহার জন্ম ও শিক্ষার দোষে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি একেবারেই ধরিতে পারেন নাই, তাঁহাব দীর্ঘকালের সাধনা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে।" ('শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন, ১৩৫৩, পৃ. ৪০৭-০৮)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের পৌষের 'ভারতবর্ষে' বীরেন দাশের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' নামে একটা গল্প প্রকাশিত হয়েছে। হুবহু সেই গল্পটিই শিরোনামাসহ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১১ বৈশাখের 'সচিত্র ভারতে' হীরেন বসু কেমন করে লিখতে পারলেন? অবাক হয়ে পূর্ণেন্দু এই সমস্যা সজনীকান্তের কাছে উপস্থিত করেছেন। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "শ্রীপূর্ণেন্দু একটা অতি সাধারণ ঘটনা দেখিয়া অবাক হইয়াছেন···। তবু তো শ্রীহীরেন পুকুরচুরি করেন নাই, নায়ক 'গাঙ্গুলী'কে 'মিত্তির' করিয়া কতকটা মৌলিকতা বজায় রাখিয়াছেন। শ্রীপূর্ণেন্দু ভুল করিয়া এই সমস্যা আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব, শ্রীযুক্ত শিবরাম ও শ্রীযুক্ত শশধর, ফুলবেঞ্চে এই পাঁচজন বিচারকের উপর এই মামলার ভার দিলে ন্যায়বিচার হইতে পারিত।" ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪, পৃ. ১৬০)

১৯৪৮ সালের এপ্রিলে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু-অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সদ্যপ্রকাশিত (এপ্রিল, ১৯৪৮) 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িয়া অবগত হইলাম, বাংলা-কথাসাহিত্যে 'স্বর্ণলতা'-প্রণেতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কঙ্কাবতী' ও 'ডমরু-চরিত' প্রভৃতি প্রণেতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 'বেনের মেয়ে'-প্রণেতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'ধর্মপাল' 'করুণা' 'অসীম' প্রভৃতির লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ('মহাস্থবির'), মণীন্দ্রলাল বসু, জগদীশ গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি লেখকদের উদ্ভব হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আধুনিক কথা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল 'বনফুল'ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞানের রাজত্বে জন্মলাভ করেন নাই। পুস্তকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য। তিনি যে তাহাদের কাছে গন্ধমাদন পর্বতের সম্পূর্ণ বোঝা উপস্থিত না করিয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিমত বিশল্যকরণী-মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতির ভার হালকা করিয়া আনিয়াছেন, ইহাতেই তাহারা কৃতজ্ঞতা বোধ করিবে।" ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫, পৃ. ১৮৫-৮৬)

১৩৫৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-আশ্বিনের 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় ডঃ সুকুমার সেনের 'বটতলার বেসাতি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন:

"'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডঃ সুকুমার সেন 'বটতলার বেসাতি' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন পড়িয়া শরৎচন্দ্রের কথা মনে হইল: 'বাপ রে বাপ! মানুষে এত পড়েই বা কখন, এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া!' শুধু কি ছাই পড়া? জনশ্রুতিও বাদ পড়ে নাই। তিনি লিখিতেছেন, 'জনশ্রুতি আছে যে ভবানীচরণ

শ্রীমদ্‌ভাগবত ছাপিয়াছিলেন (১৮৩০) বিশুদ্ধ হিন্দুমতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর টাইপ সেট করিয়াছিল এবং গঙ্গাজল সহযোগে কালি প্রস্তুত হইয়াছিল। ...অগ্রিম মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল তেত্রিশ টাকা।' দুঃখ এই, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের একমাত্র আকরগ্রন্থ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা উল্টাইবার ক্লেশটুকু তিনি স্বীকার করেন নাই! উহার ১ম খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে :—'সটীক শ্রীমদ্ভাগবত ৩২ টাকা। চন্দ্রিকা-যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামির টীকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিক-যন্ত্রে ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব....।'

সু-কুমার গবেষণায় প্রকাশ : —'বটতলায় প্রথম ছাপাখানা করেন বিশ্বনাথ দেব। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে—হয়ত দুই এক বৎসর পূর্বেই এই ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল।' অথচ আমাদের জানা আছে ১৮১৮ সনেও এই ছাপাখানা বিদ্যমান ছিল। এই বৎসর এপ্রিল মাসে রাধাকান্ত দেবের 'নীতিকথা' পুস্তকখানি বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিরীহ বাঙালী পাঠকদের উপর দুইটি ময়ূরহীন কার্তিক লেলাইয়া দিয়া সম্ভবত মজা দেখিতেছেন। একা শ্রী-কুমারে রক্ষা নাই, আবার সু-কুমার!" ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৫৫, পৃ. ৯৪-৯৫)

১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের 'মাসিক বসুমতী'তে রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'স্মৃতিরেখা' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন : "রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন তাই বিপদে পড়িয়াছি। ভাদ্রের 'বসুমতী'তে 'স্মৃতিরেখা' নিবন্ধের গোড়াতেই

তিনি লিখিয়াছেন 'উন্নত বাহু, দেহ গৌরবর্ণ গম্ভীর অথচ সুরসিক সুরেশচন্দ্র'। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কি উর্ধ্ববাহু ছিলেন, না, রায়বাহাদুরের চোখে নাসিকা বাহুরূপে প্রতিভাত হইয়াছে? গৌরবর্ণ? ভূতপূর্ব এবং আধুনিক রামতনুরা তথ্যের ধার ধারেন না—ধারিলে তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইত না, কিন্তু ভাষার ধারও কি ধারেন না তাঁহারা? তথ্যের নমুনা এই নিবন্ধেও আছে। যথা, " 'সাহিত্য' পত্রিকায় ছবি থাকত না, কাগজও উৎকৃষ্ট ছিল না।" আমরা পুরাতন 'সাহিত্য' লইয়া ঘাটাঘাটি করিয়াছি, তাহাতে ছবিও দেখিয়াছি, উৎকৃষ্ট কাগজও দেখিয়াছি। খগেন্দ্র শূন্য হইতে মর্ত্যের সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহাকে দোষ দিই না।" ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক, ১৩৫৫, পৃ. ৯৫)

মহিষাদল-মেদিনীপুর থেকে সুরজিৎ গুহ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের একদিন, সজনীকান্তকে জানিয়েছেন: "প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গত আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'ডিটেকটিভ গল্প'টির সঙ্গে **Home Library Club** কর্তৃক প্রকাশিত **Fifty Famous Detective of Fiction** বইটির **The Elusive Bullet** গল্পটির তুলনা ক'রে দেখুন তো! প্লট সম্পূর্ণ মিলে যায় না কি?"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "এ বিষয়ে যাঁহার কৌতূহল আছে, তিনি মিলাইয়া দেখুন। সুরজিৎবাবুর নিকট আমাদের বক্তব্য—আর আমাদের লজ্জা দিবেন না। বলিয়া বলিয়া শেষ পর্যন্ত দাদার সম্পর্কে আর কিছু বলিতে আমরাই লজ্জা পাই। সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা স্মিতমুখেই পথে প্রান্তরেই উলঙ্গ হইয়া বসিয়া পড়েন, তাঁহারা যোগী মানুষ, লজ্জা তাঁহারা পান না। যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা সংসারী মোহবদ্ধ জীব, লজ্জা তাঁহারাই পাইয়া থাকেন। সুরজিৎবাবুকে মোহ কাটাইতে বলি।" ('শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫, পৃ. ১৮৪)

'কেশবচন্দ্র ও সেকালের সমাজ' নামক গবেণামূলক পুস্তকে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিবেদন করেছেন: "মদ্যপানের ফলে সমাজ নরকের

পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার প্রতিকারকল্পে কেশবচন্দ্র 'সুরাপান নিবারণী সভা' আশাবাহিনী (Band of Hope) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা মদ-না-গরল নামক পত্রিকা প্রচার তাঁহার অসাধারণ মনের বলের ও দুর্জ্জয় সাহসের পরিচয়। 'আশাবাহিনী' বিনামূল্যে বিতরিত হইত।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "উদ্ধৃত অংশের ভাষা-সৌষ্ঠব দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে তরুণ কর্মীদল মদ্যপাননিবারণে প্রচারকার্য চালাইতেন, তাহাদিগকে আশাবাহিনী বলিত। মানুষ পত্রিকায় রূপান্তরিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। এইখানেই গুপ্ত-গবেষণার মাহাত্ম্য। যাহা হইক, শুধু ট্রেলার দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য নয়, ফুল লেংথ ছবিও আমরা দেখাইব।" ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র, ১৩৫৬, পৃ. ৫৯১)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, ডি-লিট, শাস্ত্রী 'জাহানারার আত্ম-কাহিনী' নামে একখানা বই লিখেছেন; ভূমিকায় তিনি, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ, নিবেদন করেছেন: "জাহানারার আত্মজীবনী কাশ্মীর থেকে পারস্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী পাঠকের উপযুক্ত করে লিখলাম জাহানারার আত্মকাহিনী।"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: " 'জাহানারার আত্মকাহিনী'র আঘাত আমরা দাঁড়াইয়া সহ্য করিব কেমন করিয়া? দোহাই 'ডঃ, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, ডি-লিট, শাস্ত্রী, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়', ন খলু ন খলু, বাঙালী পাঠকেরা আশ্রমমৃগ নয়— গার্হস্থ্য কেঁচো মাত্র, তাহাদের উপর আপনার 'মারাত্মক' ইতিহাসের তীক্ষ্ণ নৃশংসবাণ আর প্রয়োগ করিবেন না। শ্রীমতী Andrea Butenschon-এর উপন্যাস The Life of Mogul Princess (1931, George Routledge & Sons Ltd.)-কে ঐতিহাসিক 'জাহানারার আত্মকাহিনী' বলিয়া প্রচার করিবেন না। ইংরেজী ভাষার নভেলকে 'কাশ্মীর থেকে পারস্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে' বলা আর দারার

ছিন্নমুণ্ডকে দিয়া কথা-বলানো একই ধরনের ম্যাজিক। যাহা বিশ্ববিজয়ী পি. সি. সোরকারকে সাজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের তাহা সাজে না।…” (‘শনিবারের চিঠি’, শ্রাবণ, ১৩৫৭, পৃ. ৩৮৩)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপকের ছাত্রপাঠ্য পুস্তকে মারাত্মক ভুলভ্রান্তি দেখে সজনীকান্ত বিচলিত হয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন: “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যে কয়জন পণ্ডিত আছেন তাঁহাদের ‘একান্ত ছাত্রদের জন্য লিখিত’ পুস্তকগুলিতে তথ্যের ও সত্যের এত মারাত্মক ভুল যে, সেই তুলনায় ছাত্ররা যদি বিসমার্ককে চার্লি চ্যাপলিনের মা বলিত তাহাতেও দোষ হইত না। ছেলেরা না হয় মৌখিক পরীক্ষায় যা-তা জবাব দিয়া নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে; কিন্তু এই সব তথাকথিত অধ্যাপক বই ছাপাইয়া এবং স্ব স্ব দুষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া সেগুলিকে ছাত্রপাঠ্যের গৌরব দিয়া যে দেশের ভবিষ্যৎ, তরুণদের সর্বনাশ করিতেছেন, তাঁহাদের বিচার কে করিবে! এই বিভাগের শীর্ষস্থানে যিনি বসিয়া আছেন—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকমাত্রেরই সম্বন্ধে দীর্ঘ বাহান্নগজী ফতোয়া দেওয়া তাঁহার বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং তিনি পদাধিকারে আজকাল সাহিত্যতত্ত্ব রসতত্ত্ব অলঙ্কার প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি সর্ববিষয়ক পুস্তকের ভূমিকাবিশারদ হইয়াছেন; বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার হিমালয়পরিমাণ অজ্ঞতার বিচার কি বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন? তাঁহার ‘উপন্যাসের ধারা’র দ্বিতীয় সংস্করণেও তিনি ‘কঙ্কাবতী’ ‘ডমরুচরিত’ লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ করেন নাই, বনফুল বলিয়া যে একজন লেখক আছেন তাঁহার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই। এই অপরাধে যে-কোনও সাহিত্য-অধ্যাপকের বরখাস্ত হইবার কথা। বৈদেশিক ব্যাপারেও তাঁহার বিদ্যা কম নয়, তিনি মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডকে যৌনতাত্ত্বিক ফ্রড বলিয়া জাহির করিতেছেন। আর একজন বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত ডক্টর সুকুমার সেন বারবার দেখাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখাকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম লেখা বলিয়া চালাইয়া গবেষণার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িতেছেন। এই সকল অপরাধের ক্ষমা নাই। ইঁহাদের আদর্শে ছাত্রদের যদি ভুল হয়, তাহা হইলে দোষী করিব কাহাকে?…" ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩, পৃ. ১২৩-২৪)

লঙ্কার বিভীষণের সঙ্গে কি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর তুলনা হয়? সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "দৈত্যকুলে যেমন প্রহ্লাদ, ভারতকুলে তেমনই নীরদ সি. চৌধুরী। ঠিক রাতারাতি নয়—অনেক নিশীথ রাত্রের সাধনায় তিনি ভারতবর্ষের মাটিতে ইংরেজ বনিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন। লঙ্কার বিভীষণের সঙ্গে তাঁহার তুলনা আরও লাগসই হয়। রাক্ষুসে দেশে ইনিই একমাত্র রামভক্ত, শুধু কালাপানি পার হইয়া ও-পার পর্যন্ত এখনও পৌঁছিতে পারেন নাই। বুদ্ধত্ব (ইংরেজত্ব) লাভের পর তিনি 'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আন্‌নোন ইণ্ডিয়ান' লিখিয়াছেন। এই নামের 'আন্‌নোন' কথাটি ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ লেখক ভালই জানিতেন যে পুস্তকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'আন্‌নোন ইণ্ডিয়ান' 'নোন ইংরেজীনবিস' হইয়া খ্যাতি অর্জন করিবেন। হইয়াছেও তাহাই। গরু খাইয়া অনেক হিন্দু মুসলমান-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, স্বদেশের বদনাম করিয়া নীরদ সি. চৌধুরীও ইংরেজ-মহলে খ্যাত্যাপন্ন হইলেন। সুতরাং ইনি যদি 'স্টেটসম্যানে' বাংলা-সাহিত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই—যাঁহারা চেল্লাচিল্লি করিতেছেন, তাঁহারাই মূর্খ।" ('শনিবারের চিঠি', পৌষ, ১৩৫৯, পৃ. ৩৩৬)

হুমায়ুন কবির তখন দিল্লীতে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; তাঁর সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় সজনীকান্ত একটু আঁসটে গন্ধ পেয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন: "দিল্লীর মসনদের এমনই গুণ যে, তাহার আশেপাশে যাঁহারা বেঞ্চিতে টুলে মোড়ায় বসিবারও অধিকার পাইতেন

তাঁহারাও একটু সেক্‌সী (sexy) হইয়া উঠিতেন। বিশ্বাস না হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ুন। লজিকে বলে, যাহা সেযুগে হইত, মধ্যযুগে হইয়াছে, তাহা আজও হইবে। সুতরাং হুমায়ুন কবির সাহেব-সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার গায়ে যদি একটু আঁসটে গন্ধ লাগিয়াই থাকে তাহাতে দোষ হয় না। দিল্লীর রাজকর্মচারী হিসাবে ইহা তাঁহার গুণ, দোষ নহে। আমাদের আপত্তি তাঁহার নামে, হুমায়ুন বেচারী একটু সাত্ত্বিকপ্রকৃতির ছিলেন বলিয়াই আমাদের ধারণা, আর কবির তো নামকরা সাধুসন্ত। সম্পাদক মহাশয়ের নামটি জাহাঙ্গীর গালিব হইলেও 'চতুরঙ্গের রঙ্গমঞ্চে মানাইত ভাল।" (শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ, ১৩৬০, পৃ. ৪৩৯)

১৩৬১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের 'মাসিক বসুমতী'তে মনোজ বসু 'চীন দেখে এলামে'র কিস্তিতে লিখেছেন : "এক প্রান্তে নিরিবিলি একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে—এই যে বলা হয় ভিখারি নেই মোটে এদেশে—শতছিন্ন পোশাক-পরা বুড়োমানুষটা কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাই। লোকটা সরে গেল; অদূরে এক বাড়ির উঠানে গিয়ে উঠল। সেখান থেকেও অমনি তাকাচ্ছে। কিন্তু পরদেশে বাড়ির উঠান অবধি হামলা দিয়ে দয়া দেখাতে সাহসে কুলায় না। হাজার দুই ইউয়ান দোভাষির হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, দিয়ে এসো লোকটাকে—"

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"বাঁচা গেল, সোনার নূতন চীনে তাহা হইলে আমরাও আছি। সোনার সবটা সোনা নয়, খাদও আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা যাহা আছে তাহা দেখিয়া আমরা—পাবলিশাররা পুলকিত হইয়াছি। নয়া চীন আর কিছু হউক না হউক, পাবলিশারদের স্বর্গ। মনোজ ভায়া লিখিয়াছেন—

> লেখকেরা রয়ালটি পান ওখানে দশ থেকে পনেরো পার্সেণ্ট। এবং শুধুমাত্র বই লিখে চলে না, অন্য কিছু

করতে হয়। আমার বাংলা দেশের লেখকের অবস্থা এর চেয়ে ভাল বই মন্দ নয়।

প্রকাশক মনোজ বসু সাফাই গাহিবার জন্য এই মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন কিনা জানি না, বিড়াল কিন্তু থলি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শতকরা দশ যদি বাংলা দেশে শোষণ হয়, নয়া চীনে নয় কেন? দরিদ্র লেখকদের শোষণ করিয়া নয়া চীনেও পাবলিশাররা যদি ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে, তাহা হইলে আফিম ছাড়িয়া, টিকি কাটিয়া, ছোট পা বড় করিয়া কি লাভটা হইল? প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়—হাউ মাউ সে তুং?" ('শনিবারের চিঠি', পৌষ, ১৩৬১, পৃ. ৩৩১)

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' অবলম্বনে হেমচন্দ্র ও সৌরেন সেন পরিচালিত একখানা বাঙলা চলচ্চিত্র প্রথম প্রদর্শিত হয়েছে ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ১৮ চৈত্র। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "মহাভারতকারের উপর খোদকারি করিয়া 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক রচনার কালে রবীন্দ্রনাথ যদি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিতে পারিতেন যে, ভবিষ্যতে কোনও চিত্র-নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান মহাভারতকারের প্রতি অন্যায় প্রতিবিধিৎসিতে তাঁহাকেও একহাত দেখিয়া লইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৮ ভাদ্র—১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৯১ রবিবারে কটকেই তাঁহার চটক ভাঙিত! ঠিক ৬৩ বৎসর ৬ মাস পরে সে দুর্ভাগ্য তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল। তিনি লেখনীর প্রয়োগে মহাকাব্য বা এপিককে গীতি-কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, ইঁহারা স্থূল লগুড়াঘাতে গীতিকাব্যকে 'টকি' করিয়া ছাড়িয়াছেন। 'অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে'র সুইমিং-কস্টুম-পরা রূপ এমন অসহ্য হইতে পারে, 'চিত্রাঙ্গদা'র মদন তাহা দেখিলে মহাদেবের নেত্রাগ্নি ব্যতিরেকেই ভস্ম হইয়া যাইতেন। বস্তুত, এই দানবীয় শক্তিসম্পন্ন চলচ্চিত্র-পরিচালকদের মর্জির হদিস পাওয়া আমাদের সাধ্যাতীত; ইঁহারা ইচ্ছা করিলেই গৌতম বুদ্ধকে বুদ্ধদেব বসু এবং যীশু খ্রীষ্টকে ক্রীস্টফার কলম্বস বানাইয়া দিতে পারেন।

আমাদের দুঃখ ও আপত্তি ইঁহাদের অমিতাচারের জন্য নয়, সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত যাবতীয় ব্যাপারে রবীন্দ্র-মর্যাদার রক্ষক বিশ্ব-রবীন্দ্রভারতীর কর্তৃপক্ষের অতি-মিতাচারের জন্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কোমল নি শুদ্ধ নি হইলে যাঁহারা আকাশপাতাল তোলপাড় করিয়া ফেলেন চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের শিবকে বাঁদর বানাইয়া দিলে তাঁহারাই যে কেমন করিয়া শান্ত থাকেন বুঝিতে পারি না। পরম্পরায় শুনিলাম. এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শান্ত থাকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাদের একজন আবার ছবিটিকে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রানুগ বলিয়া সার্টিফিকেটও দিয়াছেন। অর্থাৎ আসলে রক্ষকেরাই ভক্ষক। এখনও চৌদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। ইহার মধ্যেই যদি এই হয়, 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' না জানি কি হইবে! ..." ('শনিবারের চিঠি', বৈশাখ, ১৩৬২, পৃ. ৮৫)

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি বিবৃতিতে সায় না দিয়ে সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"বিধুশেখর শাস্ত্রী, রাজশেখর বসু, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) প্রমুখ প্রায় ত্রিশজন সাহিত্যিক কিছুদিন পূর্বে এই মর্মে এক বিবৃতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বঙ্গ-বিহার একত্র হইলে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে না। ইহা তাঁহাদের সুচিন্তিত মত—অনেক পরামর্শ অনেক চিন্তা করিয়া এই মত তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীঅতুল গুপ্ত কাহারও নিকট শুনিয়া থাকিবেন, মতটা সুচিন্তিত নয়, ক্রীত। তাঁহার মত প্রবীণ প্রাজ্ঞ লোকের শোনা কথায় বিশ্বাস করা উচিত হয় নাই। কারণ বাংলা দেশে রটে না এমন কথা নাই। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের সময় আমরা তো সকলেই শুনিয়াছিলাম, শ্রীঅতুল গুপ্ত পাকিস্তানী মহল হইতে অনেক টাকা ঘুষ খাইয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে কুমিল্লাকে বিসর্জন দিয়াছিলেন। কথাটা অবিশ্বাস্য, কাজেই আমরা বিশ্বাস করি নাই। শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয়ের মস্তিষ্ক যদি সুস্থ থাকিত তাহা হইলে কখনও উড়ো কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি

প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেন না :

> গরীব দেশ বাংলা, গরীব তার সাহিত্যিকেরা। দেশ নিরক্ষর; পাঠকের সংখ্যা এত কম যে, বই বিক্রী করে সংসার চলে না। সেখানে যদি রাজসরকার পেনশান, সাহায্য, বই ছাপার ব্যয় ও খেতাবের জাল পাতেন তবে কিছু সাহিত্যিক যে তাতে ধরা পড়বেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

বাংলা দেশের গরীব ভদ্রলোকদের এমন অপমান মিস মেয়ো, এমন কি লর্ড কার্জনও করেন নাই। তিনি নিজে বড় উকিল। নিজের পক্ষ সমর্থনে তিনি কি এমন একটিও নজির দাখিল করিতে পারেন, যেখানে কোনও বাঙালী সাহিত্যিক উৎকোচ পুরস্কার অথবা খেতাবের খাতিরে নিজের স্বাধীন মত বিসর্জন দিয়াছেন? বুঝিতে পারিতেছি, তাঁহার কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্মভূষণ শ্রীরাজশেখর বসুর উপর অভিমান করিয়াই তিনি শাক দিয়া মাছ ঢাকিয়াছেন—ব্যাপকভাবে সাহিত্যিক্যদের আক্রমণ করিয়াছেন। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় ও 'গড্ডলিকা'য় কিঞ্চিৎ তফাত আছে। 'গড্ডলিকা'র লেখক হইলে তিনি জানিতে পারিতেন, বাংলা দেশ ততটা নিরক্ষর, ততটা গরিব নয়। দেখিতেছি 'কাব্যজিজ্ঞাসা'ই গুপ্ত মহাশয়ের মাথা খাইয়াছে। আর এক কথা, গুপ্ত মহাশয়ের ওকালতির ফী কত এবং তাহা প্রধানত কাহারা দেয়?" ('শনিবারের চিঠি,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩, পৃ. ১৩৩-৩৪)

১৩৬৪ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় পরশুরামের 'রাজ মহিষী' নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

" 'দেশ' পত্রিকার বিগত শারদীয় (১৩৬৪) সংখ্যায় 'পরশুরাম'—নামাঙ্কিত একটি গল্প পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হিসাবে সর্বপ্রথম রচনারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পটি জাল পরশুরামের। বাংলা

সাহিত্যের বর্তমান কর্ণধার মৌলিক পরশুরামের রচনা ইহা হইতেই পারে না, কারণ এটি পি. জি. ওডহাউস—মারী একটি গল্প। মূল পরশুরাম একদা বৈদেশিক একটি রচনাকে ঢালিয়া সাজিয়া 'চিকিৎসা-সঙ্কট' লিখিয়াছিলেন। লেখাটি এমন বেমালুম নূতন হইয়াছিল যে, তিনি নিজে ঋণ স্বীকার না করিলে ধরিবার উপায়ই ছিল না। তবু সাধু পরশুরাম মূল রচনার নামোল্লেখ করিয়া বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃতি-হীন ইউরোপীয় মানের বিষম ভেজালের যুগে সৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। বুড়া বয়সে তিনিই যে পুকুর চুরি করিবেন ইহা অবিশ্বাস্য।

অথচ তাঁহার নামাঙ্কিত এবং তাঁহারই একান্ত 'প্রটেক্টেড' বিচরণ-ভূমি 'দেশে' প্রকাশিত 'রাজমহিষী' গল্পটি পি. জি. ওডহাউসের 'ব্লাণ্ডিংস ক্যাসল' সিরিজের 'পিগ-হু-উ-উ-উ-ই' (Pig-hoo-o-o-o ey !) গল্পের নির্ভেজাল নকল। অতি ধড়িবাজ কোনও ছোঁড়া বুড়া পরশুরামের হাতে সুকৌশলে তামাক খাইয়াছে।...'রাজমহিষী'র লেখক জাল, জুয়াচোর। এই জুয়াচোরকে অবিলম্বে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া উচিত।" ('শনিবারের চিঠি,' কার্তিক, ১৩৬৪, পৃ. ২)

মণি বাগচি বইয়ের পর বই লিখে চলেছেন। সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন: "শ্রীমণি বাগচি একজন উদ্যোগী গ্রন্থকার। তাঁহার তুল্য তৎপর ও উৎসাহী গ্রন্থ-রচয়িতা বাংলা দেশে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। মহাকবি শেক্সপীয়রের বয়ান তিনি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন না, জোয়ারের মুখেই স্রোতকে ধরিয়া ফেলিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে মুখামুখি মুলাকাৎ করিয়া থাকেন। লোকে 'অরবিন্দ অরবিন্দ' করিতেছে, উত্তম। লেখ অরবিন্দের উপরে বই। সিপাহী বিদ্রোহ? তাহাতেও পিছপাও নহি। বিদ্যাসাগরী হাওয়া বহিতেছে, বাদাম তুলিয়া দাও। দিয়াছেনও। কাজেই তাঁহাকে হতভাগিনী 'নিবেদিতা'কেও রক্ষা করিতে হইয়াছে। আমাদের মনে হয় বাগচি মহাশয় যদি বাল্মীকির আমলে জন্মাইতেন তাহা হইলে তমসাতীর-প্রত্যাবৃত্ত দেবর্ষি নারদের মুখে বাল্মীকির রামায়ণ-রচনার ঘোষণা মাত্র শুনিয়া রাতারাতি এক-

খানি রামায়ণ রচনা করিয়া দিতেন, রত্নাকরের নির্মোক বাল্মীকির গা হইতে আর খসিত না।…" ('শনিবারের চিঠি,' শ্রাবণ, ১৩৬৫, পৃ. ৩৪০)

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'বসুধারা'য় একটি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে, শিরোনামা 'পরমহংসদেবের ভক্তবৃন্দ (১৬ আগস্ট ১৮৮৬)'। তলায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দের নামের তালিকা আছে—নরেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রলাল সরকার, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত…

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, এই তালিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, নবাব আবদুল লতিফ, বিপিনচন্দ্র পাল ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (তখন বয়স দশ) নাম নাই। সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের অধ্যাপক গুরুজন, এবং গ্রন্থনাকার শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, স্পিরিট ফোটোগ্রাফিতে তাঁহারা ছিলেন ইহা বলিতে সাহস জুয়াইল না।

পরমহংসদেব ১৮৮৬ সনের ১৬ই আগস্ট তারিখে ইংরেজীমতে ভোর একটা তুই মিনিটের সময় মহাসমাধিস্থ হন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মধ্যাহ্নে দেহ পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করেন আধঘণ্টা পূর্বে পরমহংসদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন। বৈকাল পাঁচটায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রস্তাবে পরমহংসদেবের নশ্বর দেহসহ ভক্তবৃন্দের একটি ফোটো তোলা হয়। সন্ধ্যা ছয়টায় শোভাযাত্রা করিয়া সন্নিহিত শ্মশানে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়। এই চিত্রে শুধু ভক্তবৃন্দই ছিলেন, স্বয়ং মহেন্দ্রলাল সরকার ভক্ত নন বলিয়া সরিয়া দাঁড়ান।…এই দলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন না, মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন না, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন না, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন না। এবং কেশবচন্দ্র সেনের থাকিবার উপায় ছিল না, কারণ ঠিক আড়াই বৎসর এক মাস আটদিন পূর্বে ১৮৮৪ সনের ৮ই জানুয়ারি তারিখে তিনি নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া যান।…" ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬, পৃ. ১৩৩)

'রবীন্দ্র-সরোবর' নাম সজনীকান্ত পছন্দ করেননি ; মন্তব্য করেছেন : "সংবাদপত্রে ইদানিং 'রবীন্দ্র-সরোবর' নাম দেখিতে পাইতেছি। রবীন্দ্র-শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকুরিয়া লেকের অথবা তাহার অংশবিশেষের এই নাম হইয়া থাকিবে। ভালই। জীবনে বীতস্পৃহ কোনও রবীন্দ্রভক্ত এখানে ডুবিয়া মরিয়াও সান্ত্বনা লাভ করিবে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, একটা রাস্তা, পার্ক অথবা পুকুরের নামের সহিত যুক্ত হইয়া ধন্য হইবেন, রবীন্দ্রনাথ সে জাতীয় পাড়ার বড়লোক বা কাউন্সিলার শ্রেণীর মনুষ্য নহেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে। বর্তমানে কাগজ-ছাপাই-বাঁধাইয়ের দুর্মূল্যতার জন্য 'রচনাবলী'র যা দাম সকলের পক্ষে ইচ্ছা থাকিলেও সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পড়া সম্ভবপর নয়। যদি জনসাধারণের চাঁদায় অথবা সরকারের বদান্যতায় এই রচনাবলীর মূল্য যথেষ্ট হ্রাস করিয়া বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে দেশবাসীর চিত্তে চিরজাগ্রত থাকিবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ পাইবেন। তিনি যদি অপঠিত থাকিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই দেখা যাইবে ঢাকুরিয়া-পাড়ার তখনকার অধিবাসীরা রবীন্দ্র-সরোবর কোন রবীন্দ্রনাথের নামে তাহা লইয়া গবেষণা করিতেছেন। হয়তো ততদিনে স্থানীয় চালকলের বড়লোক মালিক একজন রবীন্দ্রনাথ অথবা চলচ্চিত্র-নক্ষত্র একজন রবীন্দ্রকুমার গজাইয়া উঠিবেন। এইরূপ যে ঘটিবে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাই প্রিন্সেপ ষ্ট্রীটের বেলায়। যিনি ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার কৌশল আবিষ্কার করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্মস্থলে আমাদিগকে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন তাঁহার নাম আমরা শহরের মান-চিত্র হইতে মুছিয়া ফেলিতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত বা লজ্জিত হই নাই। সরোবরকে রবীন্দ্র নামাঙ্কিত করাতে রবীন্দ্র সরোবরকে একদিন কায়কোবাদ-সরোবর করিবার সম্ভাবনাও তো রহিয়া গেল।" ('শনি-বারের চিঠি', আষাঢ়, ১৩৬৭, পৃ. ২৬৩-৬৪)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মারা গেছেন ১৯৬০ সালের ২৫ জুন ; তাঁর মৃত্যুর

পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'কোয়েস্ট' পত্রিকায়—১৯৬১ সালের মে মাসে।

সজনীকান্ত মন্তব্য করেছেন :

"কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃতের সঙ্গে কোন্দল করা অশোভন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে এমন একটি অপকর্ম করিয়া গিয়াছেন যাহার প্রতিবাদ না করিলে আমরা কোন দিনই নিজেদের ক্ষমা করিতে পারিব না। ইংরেজী ত্রৈমাসিক 'কোয়েস্ট' পত্রিকা রবীন্দ্র-সংখ্যায় [মে, ১৯৬১] সুধীন্দ্রনাথের 'গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ ছাপিয়াছেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্র-জীবন সম্পর্কে তিনি এমন একটি কুৎসিত উক্তি করিয়াছেন যাহা আমাদের বিবেচনায় রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত সমস্ত রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আপত্তিকর মিথ্যা ভাষণ। 'কোয়েস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যকে অবহেলা করা সমীচীন হইবে না, কারণ এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা কলিকাতা বোম্বাই ও দিল্লিকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছে। ইহার সম্পাদক যুগল হইলেন কলিকাতার আবু সৈয়দ আয়ুব ও অম্লান দত্ত, ইহা প্রকাশিত হয় বোম্বাই হইতে এবং ইহারা দাবি করিতেছেন যে, পত্রিকাখানি 'ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কাল-চারাল ফ্রিডম' কর্তৃক পরিপোষিত।

সুধীন্দ্রনাথের লেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করার আর একটি কারণ এই যে, তিনি রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের একজন বিশিষ্ট কবি, উপরন্তু তিনি কবিগুরুব স্নেহসান্নিধ্যও লাভ করিয়াছিলেন। 'আকাশ-প্রদীপ' কাব্যখানি তাঁহার নামেই উৎসৃষ্ট। উৎসর্গ পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া-ছিলেন, 'আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।' উত্তরসূরি সুধীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র' হইতে কবিগুরুর রচনা এবং সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনকে গ্রহণ করিয়া কিভাবে সেই স্নেহের ঋণ শোধ করিয়াছেন তাহারই চূড়ান্ত নিদর্শন 'গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। সুধীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'Then too he was ever lonely : very much older in age, his famous brothers had their proper talents to tend ; and the compulsory company of his female relations induced an inferiority complex, from which he could not escape except by taking refuse in the manorial gardens of his retiring father to watch the play of sunlight on the shadowy pond. That in course of time he and the wife of his brother Jyotirindranath fell desperately in love with each other did not mend matters at all ; and when the family married him off presumably to prevent scandal, bad got worse and worse until his sisters-in-law killed herself.' (Quest, P. 21)

অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথের মতে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁহার বৌঠান বেপরোয়াভাবে পরস্পরের প্রেমে পড়িয়াছিলেন। কেলেঙ্কারি ঢাকিবার জন্য অভিভাবকগণ রবীন্দ্রনাথের বিবাহের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতে লাগিল, অবশেষে রবীন্দ্রনাথের বৌঠান আত্মহত্যা করেন।—এই উক্তির দ্বারা সুধীন্দ্রনাথ শুধু রবীন্দ্রনাথকেই নয়, সমস্ত ঠাকুরবাড়িকেই জড়াইয়াছেন। ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ জ্যোরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী চব্বিশ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ আত্মহত্যা করেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেইশ বৎসব ; সাড়ে চারি মাস পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যাকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়াইয়া সেই যুগে মহর্ষি-পরিবারের শত্রুগণ যে কুৎসা রটনা করিয়াছিলেন তাহারই পূর্ণাহুতি দিলেন সুধীন্দ্রনাথে দত্ত কবির শতবার্ষিক মহোৎসবে।···

সুধীন্দ্রনাথ আজ সমালোচনার অতীত। তিনি অন্তিম বিকারের ঘোরে যে প্রলাপ বকিয়াছেন, তাহা যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন সমগ্র বাঙালী জাতির ধিক্কার তাহাদেরই প্রাপ্য।" ('শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮, পৃ. ১৪২-৪৩)

যথেষ্ট নমুনা দেখা হয়ে গেল, আপাতত আর দরকার নেই। এই নমুনাসমূহ থেকেই প্রত্যয় হয় যে 'দাদাঠাকুর' নামে খ্যাত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত রঙ্গ করে সজনীকান্ত সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন—নিপাতনে সিদ্ধ।

শেষ